হারেম

আবু ইসহাক

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

সূচি

কানাভুলা : ০৯
ঘুপচি গলির সুখ : ১৬
দাদীর নদীদর্শন : ২০
পন্ডশ্রম : ২৭
পিপাসা : ৩৬
প্রতিষোধক : ৪৪
বনমানুষ : ৬৩
বোম্বাই হাজী : ৭২
শয়তানের ঝাড়ু : ৮২
হারেম : ৯৩

কানাভুলা

অন্ধকার বারান্দা। এক পাশে শুয়ে আছে জাহিদ। উদ্বেগ আর আশঙ্কা তার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সে এপাশ-ওপাশ করছে বারবার। রাত আর কতক্ষণ আছে কে জানে ? নিদ্রাহীন রাত আর পোহাতে চায় না। ঐ—ঐ আবার!

—উহ্, মইর‍্যা গেলাম গো, উহ্-উহ্-উহ্—

স্ত্রীকণ্ঠের চাপা চীৎকার। ব্যথাকাতর সে চীৎকারে শিউরে ওঠে নিস্তব্ধ রাত্রি।

—উহ্ মাগো-উহ্-উহ-উহ্–

—চিল্লাইও না, বউ। আল্লার নাম লও। আল্লায় রহম করব।

—আল্লাগো–ও আল্লাহ্—

জাহিদের শিরা-উপশিরা বেয়ে শীতল শিহরণ প্রবাহিত হচ্ছে। দ্রুত তালে চলছে হৃৎস্পন্দন। সে মাথা তোলে। উঁকি মারে তরজা বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

ঘরে কেরোসিন-কুপি মিটমিট করছে। আর মৃদু আলোয় দেখা যায়—রাহেলা বালিশের ওপর দুই কনুই দিয়ে উপুড় হয়ে হাঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছে, চীৎকার করছে। তার মা বউয়ের মাথায় পিঠ হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এক পাশে শুয়ে আছে নাই রঞ্জার মা। এত গোলমালের মধ্যেও সে দিব্যি ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

জাহিদ বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে আবার।

কুই—ক্কু—রু—উ—উ—ত্কু—উ—উ—

মোরগ বাক দিয়েছে। রাত আর বেশি নেই। বাইরে খড়মের আওয়াজ পাওয়া যায়। পাছ-দুয়ারের কাছে শোনা যায়, রাঙা চাচীর গলা,—অ জাহিদের মা, মরিয়ম ফুল ভিজাইয়া পানি খাওয়াইছস ?

—হ, বইন। কিন্তুক কিছুতেই কিছু অইল না। হেই কাইল দুফরের আগে ব্যথা শুরু অইছে।

দরজা খোলার শব্দে বোঝা যায়, রাঙা চাচী ঘরে ঢুকছে। সে বলে,—ঘুমাইয়া পড়ছ নি রঞ্জার মা ?

—অ্যা—

—ওডো না। দ্যাখো আবার চেষ্টা কইর‍্যা।

—দ্যাখ্লাম তো কতবারই। আবার দ্যাখ্তে আছি।

—উহ্ মাগো, আর পারি না।

—এট্টু সইজ্যা কইর‍্যা থাক্। আল্লা আল্লা কর। দেখি, দ্যাখ্তে দে।

খানিক পরে আবার তারই গলা শোনা যায়,—উহু, অখনো কিচ্ছু না। পয়লা-পরথম, দেরি তো অইবই।

কিন্তু দেরি হতে হতে ভোর হয়ে যায়। আরো কত সময় নেয়, কে জানে?

রোজ অন্ধকার থাকতে জাহিদ রিক্‌শা নিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আজ আর বেরুতে মন চাইছে না তার। সে রিক্‌শার টুকিটাকি অংশগুলো খোলে, পরিষ্কার করে আবার যথাস্থানে লাগায়। চেইন খুলে সাফ করে। এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে। রিক্‌শার আসলে হয়নি কিছুই। ছুতো করে কাজে না যাওয়ার মতলব।

—আল্লাগো—আহ্—আহ্।

স্ত্রীর কাতরানি। আগের চেয়ে ঘন ঘন শোনা যায় এখন। এক একটা দূরাগত ব্যথার ঢেউ যেন জাহিদের পেটের নাড়ি-ভুঁড়ির ওপর আছড়ে পড়ছে। এক সময়ে তার কর্মরত হাতদুটো থেমে যায়। রিক্‌শার টুকিটাকি অংশগুলো ছড়িয়ে পড়ে থাকে এদিক-ওদিক।

মা'-র ডাকে তার চমক ভাঙে।

একটা বোতল তার দিকে এগিয়ে দিয়ে তার মা বলে,—শিগ্‌গীর রাস্তার কলের তন পানি ভইর‍্যা পাইকপাড়ার পীর সাবের কাছে যা। তেনার কাছে ভাইঙ্গা কইস। দুইডা ফুঁ দিয়া দিব। তেনার পানি-পড়া খাইলে বিনে কষ্টে খালাস অইয়া যাইব।

জাহিদের হাত এবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রিক্‌শার টুকিটাকিগুলো জায়গা মত বসাতে লেগে যায় সে।

তার মা আবার বলে,—তোর কাছে ট্যাকা আছে না? পাঁচটা ট্যাকা নজর দিস হুজুররে। আর হোন, হুজুরের মোখের কাছে বোতল নিস না। তেনার ফুঁ-এর তেজে কিন্তুক বোতল ফাইট্যা চৌখণ্ড অইয়া যাইব।

জাহিদ বোতলটাকে রিক্‌শার আরোহী-আসনের নিচে কাত করে রেখে দেয়। তারপর ঝড়ের বেগে রিক্‌শাটাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

দু'মাইল রাস্তা যেতে বেশিক্ষণ লাগে না জাহিদের। পীর সাহেবের বাড়ি কাছে গিয়ে রাস্তার টিপকল থেকে সে বোতলটাকে ভরে নেয়।

জাহিদের ভাগ্য ভালো। পীর সাহেব খানকাশরীফে তশরীফ এনেছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছে অনেক সাগরেদ-মুরীদ।

বোতল হাতে জাহিদ ঘরে ঢোকে। হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে যায়, বলে,—আছ্‌লাম আলায়কুম।

সাগরেদদের একজন হাতের ইশরায় তাকে বসতে বলে।

একজন লোক হাঁটু গেড়ে বসে আছে পীর সাহেবের সামনে। পীর সাহেব তার কাঁধ চাপড়ে বলেন,—তোমার ঈমান বহুত জয়ীফ। ঈমান পোক্ত কর। ইনশাল্লাহ আরাম হইয়া যাইব। আর যা যা বাতলাইয়া দিলাম, ইয়াদ আছে তো? হররোজ গোছলের সময় হাতের তালুর উপর তাবিজখান রাখবা। তারপর ঐ হাত দিয়া উডাইয়া তিন ঢোক পানি খাবা।

কে একজন এসে ঘরে ঢেকে। পীর সাহেব ব্যস্তভাবে তাকে জিজ্ঞেস করেন,—কি খবর?

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

—খবর ভালো। ছেলে হইছে।

—অ্যাঁ ছেলে! শোক্‌র আল-হামদুলিল্লাহ। এই শামসের, আজান দাও, আজান দাও মিয়া।

শামসের নামের সাগরেদটি উঠে যায়। পীর সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন,—আমার ছোটমেয়ের ছেলে হইছে। পয়লা-পরথম ছেলে। তোমরা সকলে দোয়া করিয়া।

আজান শুরু হয়ে গেছে। পীর সাহেবের সাথে অনেকেই মনে মনে আজানের জবাব আওড়াচ্ছে। জাহিদ কিছু বুঝতে না পেরে বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একজন সাগরেদের ইশারা ও সেই সাথে ভ্রুকুটি লক্ষ করে সে বুঝতে পারে—এ সময়ে এভাবে দাঁড়ান অন্যায় হয়েছে তার। সে আবার বসে পড়ে।

আজান শেষ হয়। পীর সাহেবের সাথে সবাই শরীক হয় মোনাজাতে। মোনাজাত শেষ হলে জাহিদ পীর সাহেবের সামনে যাওয়ার উদ্যোগ করে আবার। কিন্তু তার আগেই আর একজনের আরজি পেশ হয়ে গেছে।

—হুজুর, কোন ফল বোঝ্‌তে পারতাছি না।

—অ্যাঁ, কোন ফল বোঝতে পার না!

—না হুজুর, তা কই না। কিছু কিছু ফল বোঝতে পারি।

—তা-ই কও। তোমার পয়লা কথা শুইন্যা আমি তো তাজ্জব! তোমরা গাছের দানা লাগাইয়া দিনে দিনেই ফল খাইতে চাও। আগে গাছ হইব, গাছ বড় হইব, তারপরে তো ফল। ব্যারাম-আজার আল্লাতায়ালা পাঠান বান্দার ঈমান পরীক্ষার জন্য। তোমরা আয়ুব আলায়হেস সালামের কিচ্ছা শোন নাই?

—হঁ হুজুর, শুনছি। একসাথে কয়েকজন কলরব করে ওঠে।

পীর সাহেব আবার বলেন,—আরাম হইব, আস্তে আস্তে আরাম হইব। ঘাবড়াইও না।

লোকটি বলে,—হুজুর, আর একটা কথা। আমাগ ঘরের মানুষটারেও বুঝি এই ব্যারামে ধরছে। কাইল কাশ্‌তে কাশ্‌তে বমি কইর‍্যা দিছিল। বমির লগে রক্ত।

—অ্যাঁ, তা-ই নাকি! শোক্‌র্ আল্‌হামদুলিল্লাহ। ব্যারামটা যখন দুই ভাগ হইয়া গেছে, তখন তার জোরও কইমা গেছে ইনশাল্লাহ। ব্যারামটা যত বেশি লোকের মধ্যে ভাগ হইব, ততই বেহ্‌তেরীন। তোমরা বোঝ্‌তেই পার, এক তিল পরিমাণ জহর একজনের জান খরচ করতে পারে। কিন্তু ঐ পরিমাণ যদি একশো' জনের পেডে যায়, কেউ টেরই করতে পারবে না।

একটু থেমে তিনি আবার বলেন,—তোমার চিন্তার কারণ নাই। বদরক্তগুলো খারিজ হইয়া গেলেই আরাম হইয়া যাইব ইনশাল্লাহ।

জাহিদের মনের মধ্যে পীর সাহেবের কথাগুলো জটলা পাকাতে শুরু করেছে। সে ছেলেবেলায় মাইনর স্কুলে পড়ত। তার পঠিত স্বাস্থ্য বইয়ের উপদেশগুলোর ওপর পীর সাহেবের কথাগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে।

পাশের একজনের আঙুলের টোকায় তার চমক ভাঙে। লোকটি বলে,—কি মিয়া, চুপ কইর‍্যা রইছ ক্যান ? তোমার না খুব গরজ দেখছিলাম ?

জাহিদ বোতল নিয়ে পীর সাহেবের কাছে যায়। বলে,—হুজুর, আমার পরিবার বড় দুঃখ পাইতে আছে। খালাস অইতে আছে না।

পীর সাহেব চোখ বোজেন। তাঁর ঠোঁট নড়ছে। জাহিদ বোতলটা ধরে থাকে। পীর সাহেব তিনবার ফুঁ দিয়ে হাতের ইশারায় সরে যেতে বলেন তাকে। জাহিদ তাঁর পায়ের কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট রেখে বোতল হাতে বেরিয়ে আসে।

জাহিদ বোতলটাকে আরোহী-আসনের নিচের খোড়লের মধ্যে খাড়া করে রাখে। ওটা যাতে পড়ে না যায় সে জন্যে সে আলগা সীটটার একটা পাশ খোড়লের মধ্যে ঢুকিয়ে বোতলটাকে চাপ দিয়ে রাখে।

জাহিদ রিক্‌শা নিয়ে রওনা হয়। সামনে তাকাতেই দেখে দু'জন মহিলা পীর সাহেবের বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরুচ্ছেন। পরিধানে তাঁদের ধবধবে সাদা পোশাক। একটু এগিয়ে যেতেই সে তাঁদের চিনতে পারে। মহকুমা শহরের একমাত্র লেডি ডাক্তার আইরিন গোমেজ আর নার্স সুশীলা বিশ্বাস। জাহিদ আশ্চর্য হয়। পীর সাহেবের বাড়িতেও তাহলে এদের দরকার পড়ে!

—এই রিকশা—

—এখন নিতে পারমু না, দিদি।

—কেন ?

—আমার একটু জলদি আছে।

রিক্‌শা ছুটে চলে।

কিন্তু একটু দূরে গিয়েই কি ভেবে জাহিদ রিক্‌শা ঘোরায়।

ডাক্তার ও নার্স রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে জাহিদ বলে,—আসেন দিদিমণিরা, আপনেগ লইয়া যাই। এইখানে রিক্‌শা পাইতে দেরি অইব আপনেগ।

জাহিদ রিক্‌শা থেকে নেমে সীটটাকে ঠিকমত বসিয়ে দেয়। বোতলটা খোড়লের মধ্যে কোন অবলম্বন ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছু দূর যাওয়ার পর ডাক্তার বলে ওঠেন,—কি পড়ছে হে, জল যেন ?

জাহিদ পেছনে তাকিয়ে দেখে, সীটের তলা দিয়ে টপ্‌টপিয়ে পানি পড়ছে।

গাড়ির প্যাডেলে জোরে পা মারতে মারতে সে বলে,—যাউক পইড়্যা, রাস্তার কলে পানির আকাল কি ?

বড় রাস্তা ধরে রিক্‌শা ছুটে চলে। অনেক দূর গিয়ে রিক্‌শা একটা গলির মধ্যে ঢোকে।

লেডি ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠেন,—এই,—এই রিক্‌শাওয়ালা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

—দিদিমণি, একজন রুগী দেইখ্যা যাইতে অইব। রিক্‌শার গতি একটুও না কমিয়ে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে জাহিদ বলে।

—না না, সময় নেই এখন।

—একটু দয়া করেন দিদিমণি। রুগীর অখন-তখন অবস্থা।

—বলছি তো এখন সময় নেই। থামাও থামাও। ঘোরাও রিক্‌শা।

তার কথা শেষ না হতেই রিক্‌শা গিয়ে থামে জাহিদের বাড়ির উঠোনে।

—ও মাগো—ও আল্লাগো—উহ্‌—উহ্‌!

ঘর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের কাতর চীৎকার ভেসে আসছে।

ডাক্তার ও নার্স পরস্পরের মুখের দিকে তাকান।

জাহিদ জোড়হাত করে বলে,—দিদিমণি, আপনেগ পায়ে পড়ি। আমার স্ত্রী বড় কষ্ট পাইতে আছে। আপনারা না দ্যাখ্‌লে মইর‍্যা যাইব।

শব্দ পেয়ে জাহিদের মা বেরিয়ে আসে। জাহিদ বলে,—মা, এনাগ ঘরে লইয়া যাও।

—হ যাই। তোরে যার লেইগ্যা পাডাইছিলাম, হেইডা কই ?

—হঁ, দিতে আছি। তুমি আগে দিদিগ ঘরে লইয়া যাও; রুগী দেখাও।

জাহিদের মা ঘরে যায়। তার পেছনে যান ডাক্তার আর নার্স।

জাহিদ সীটটা তুলে দেখে বোতলটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ওতে আর এক ফোঁটা পানিও নেই।

সে একটু বিব্রত হয়। মনে মনে বলে,—মা এখনি আইসা বোতল চাইব। কিন্তু খালি বোতলডা কেমন কইর‍্যা দেওয়ন যায়!

যমজ ছেলে আর মেয়ে। জন্মের সময় আট মাসে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত ছিল। এখন অনেক বেড়ে উঠেছে, খলবলে হয়েছে বেশ।

দুই নাতি-নাতনীকে দুই কাঁখে নিয়ে জাহিদের মা একদিন জাহিদকে বলে,—হুজুরের অছিলায় এক্কই থাবায় আসমানের চান-সুরুজ ঘরে আন্‌ছি। তেনার দোয়ার বরকতে আল্লায় ওগ ভাল্‌-বালাই রাখছে।

একটু থেমে আবার সে বলে,—গেল ভাদ্দর মাসে ও-গো আঠারো মাস পুরা অইছে। অখন আর বাও-বাতাসের ডর নাই। একদিন ও-গো হুজুরের কাছে লইয়া যাইতে চাই। তুই কি কস ?

—যাইতে চাও, যাও। এইডা তো ভাল কথা।

—হে অইলে আহে শুক্কুরবারে চল্‌ যাই। বউরেও লইয়া যাইমু। তেনার দয়ায় ও বাঁইচ্যা আছে। তেনার পানি-পড়া না অইলে কি আর ওরে বাঁচাইতে পারতাম ?

পীর সাহেবের বাড়ি যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে যায়। হালুইকরের দোকান থেকে বড় এক হাড়ি মিষ্টি আসে। হুজুরের নজরানা বাবদ জাহিদের মা-র আঁচলে বাঁধা পড়ে একটা দশ টাকার নোট।

মা ও স্ত্রীকে রিক্‌শায় বসিয়ে রওনা হয় জাহিদ। তাদের দু'জনের কোলে দুই শিশু। গলিটা পেরিয়ে রিক্‌শাটা ডান দিকে মোড় নেয়, বড় রাস্তা ধরে ছোটে।

—এই দিগে যাস কই জাহিদ ?

—ঠিক পথেই যাইতে আছি মা।

—ঠিক পথে! তোরে কি দিনে-দুফরে কানাভুলায় পাইছে ?

—না মা, কানাভুলায় পায় নাই।

—আম্মাজান, কানাভুলা কারে কয় ? রাহেলা তার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করে।

—কানাভুলা এক রহমের ভূত। এই কানা ভূত পথ ভুলাইয়া উলডা পথে লইয়া যায়। হেরপর ঘাড় মটকাইয়া রক্ত খায়।

—ওঃ, বোঝতে পারছি, পথ ভুলাইন্যা ভূত। আমার নানাগো দেশে কয় দিগাভুলা।

কিছুদূর গিয়ে রিক্‌শাটা একটা সরু গলিতে ঢোকে।

—এই দিগে কই যাস, জাহিদ ? তোরে ঠিক কানাভুলায় পাইছে, আমি বোঝতে পারছি।

—না মা, কানাভুলায় আর পথ ভুলাইতে পারব না, ঘাড় মটকাইয়া রক্ত খাইতে পারব না কোনদিন।

—কিন্তু পীরসাব তো থাকেন উত্তরমুখী, পাইকপাড়া—

—তুমি কিচ্ছু চিন্তা কইর‍্য না মা। যার অছিলায় চান-সুরুয পাইছ, তার বাড়িতেই যাইতে আছি। ঐ যে দ্যাখ্যা যায় তার বাড়ি।

৩৮/৫-ই জাহাঙ্গীর রোড, পূর্ব করাচী
১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ নভেম্বর, ১৯৬২

ঘুপচি গলির সুখ

পরীক্ষার খাতায় পঁয়ত্রিশ নম্বর আর পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরি—এই ছিল হানিফের চরম আকাঙ্ক্ষা।

থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করল হানিফ। আকাঙ্ক্ষার প্রথমটা পূর্ণ হল। আর দ্বিতীয়টা খাবি খেয়ে মরতে লাগল। ঝাড়া দুটো বছর ধরে কত যে চেষ্টা তদবির করল সে, কতজনের দুয়ারে ধর্ণা দিল, কিন্তু পঁয়ত্রিশ টাকার একটা চাকরি জুটল না। সে বুঝতে পারল, তার আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হবার নয়। অগত্যা বিশ টাকা মাইনের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারী নিল সে। কোন গতি নেই যার, সেই হয় মাস্টার।

পাঁচ বছর পরে চাকা ঘুরল। হানিফেরও কপাল ফিরল। যুদ্ধের ডামাডোলের বাজারে জুটে গেল একটা কেরানিগিরি। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে, আঠারো টাকা মাগ্‌গী ভাতা। দিব্যি চাকরি, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্থায়ী। যে কোন সময়ে বিনা কারণে, বিনা নোটিশে ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার কি আছে ? জীবনটাই তো অস্থায়ী। আর বজ্র যখন আঘাত হানে, তখন কি নোটিশ দেয়, না কারণ দর্শায় ?

হানিফের আকাঙ্খা পূর্ণ হল। তবে কিনা তিন টাকা মনের চালের দাম হয়েছে তিরিশ টাকা, আর এক টাকার শাড়ির দাম হয়েছে দশ টাকা। অন্যান্য জিনিসের দামও বেড়েছে এই হারে। তবুও সে পরিতৃপ্ত। সাফল্যের আনন্দে সে মানতের তিন টাকা পাঠিয়ে দেয় খাজা বাবার দরগায়।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই বলে নাকি মানুষ সুখী নয়। তাকে পৃথিবীর অর্ধেক দিয়ে দিলেও নাকি সে খোঁজ করবে—বাকী অর্ধেক কোথায় ? জীবনে সুখী হওয়ার জন্যে তাই অনেক সাধ্যসাধনা করে হানিফ আকাঙ্ক্ষা দমনের অনেক কৌশল আয়ত্ত করেছে।

হানিফ বিয়ে করেছে সাত বিল তেরো খাল পেরিয়ে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। 'ক'-জানে না করিমন তার স্ত্রী। কিন্তু নিরক্ষর হলে কি হবে, তার গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। গুণের কথা তুলতেই কেউ হয়তো তাকে জিজ্ঞেস করে বসবে,—পোলাও-কোর্মা রাঁধতে জানে ?

উত্তরে সে বলবে,—না, তা জানে না। পোলাও-কোর্মা আমাদের পকেট খালি ও পেট খালাস করে দেয়। তাই ভেবে আমার স্ত্রী তা রাঁধতে শিখেনি। তবে গুঁড়ামাছ, শাক, ডাল আর ভাত রান্নায় সে দক্ষহস্ত। মিলের মোটা শাড়ি তালি দিয়ে পরতে অভ্যস্ত। স্বামীর খেদমতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত, কারণ তার পায়ের তলায় নাকি বেহেশ্‌ত। মাসের শেষের

দিকে নুন-ভাত খেয়েও তৃপ্ত। মিতব্যয়িতার বুদ্ধিতে দীপ্ত। ম্যালেরিয়া জ্বরে না হয় জব্দ। স্বামীর কটু কথায় না করে শব্দ।

এমন গুণবতী স্ত্রীকে বোরখা মুড়ি দিয়ে রেল-ষ্টীমারের পুলসেরাত পার করে হানিফ ঢাকা নিয়ে এলো। সাথে তিনটে ছেলে-মেয়ে। নাজিরা বাজারের এক ঘুপচি গলির শেষে, নর্দমার পাশে, খানদানী দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে একটা কোচোয়ানী কুঁড়েঘর তার বাসা। ভাড়া দশ টাকা।

স্ত্রী খুশী। কারণ এহেন বাসায় তার পর্দার কোনরূপ বরখেলাপ হবে না। আর বাচ্চাকাচ্চাদের গায়ে বাও-বাতাস লেগে অসুখ করবে না।

হানিফ মহাখুশী। কারণ, বেনারসী, জামদানী, ক্রেপ, জর্জেটের ঝলমলানি আর সোনা গয়নার চকমকানি তার স্ত্রীর চোখে জ্বালা ধরাবে না। এসেন্স আর সুবাসিত তেলের সুগন্ধ নর্দমার দুর্গন্ধ ছাপিয়ে তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করবে না। রুজ-লিপষ্টিক দূরের কথা, হেজলিন-পমেডের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হবে না কোন দিন। বিজলি বাতির আলো চোখ ধাঁধাবে না। সিনেমার বিজ্ঞাপন অনধিকার প্রবেশ করবে না। আর রেডিওর গান শরীয়ত বরবাদ করবে না। অল্প কথায় বলতে গেলে খানদানী দেয়াল বেষ্টিত করিমনের দুনিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। চার দেয়ালের মাঝে তাঁর আকাঙ্ক্ষার ঘোড়া স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াবে। চার দেয়ালের মাঝেই থাকবে তার 'সব পেয়েছির দেশ।'

হানিফের সংসার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু ফেরিওয়ালারা তার বাজেট ঘাটতির ফিকির করলে যে। সে অফিসে গেলেই এদের আনাগোনা শুরু হয়। ছেলে-মেয়েদের চানাচুর, আইসক্রীম, বিস্কুট, লজেন্স, চরকি, বেলুন দিয়ে রোজ কম-সে কম চার গণ্ডা পয়সা নিয়ে যায়।

আয়ের একটা বিরাট অংশ এভাবে বাজে খরচ হবে, এটা বরদাস্ত করতে পারে না হানিফ। অনেক মাথা খাটিয়ে শেষে একটা ফন্দি বার করে সে। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের বেশ কায়দা করে বুঝিয়ে দেয়,—ফেরিওয়ালারা সব ছেলে-ধরা সুযোগ পেলেই ধরে নিয়ে পালাবে।

ফন্দিটা তার কাজে লেগে গেছে। ফেরিওয়ালা তাদের লোভনীয় হাঁকডাকেও আর ছেলে-মেয়েগুলোকে কাছে ভিড়াতে পারে না আজকাল। তাদের হাঁক শুনলেই ওরা এখন ওদের মা'র বুকে এসে লুকোয়।

চাকরির প্রথম কয়েক মাস কোথায়, কিসে, কেমন করে কত খরচ করা দরকার ঠাহর করে উঠতে পারেনি হানিফ। তাই প্রত্যেক মাসে তার কিছু কিছু দেনা হতে লাগল। এ দেনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ব্যয় সঙ্কোচ করা জরুরী হয়ে পড়ল। খরচের খাতা হাতড়ে সে দেখে—বুড়ো বাবা ও মাকে মাসে মাসে যে পনেরো টাকা পাঠায়, সেটাই একমাত্র বাজে খরচ। এ টাকা ক'টা না পাঠালে তার সংসারে টান-তাগাদা আর থাকবে না। শেষে তাই করে সে। বিবেক অবশ্য প্রতিবাদ করেছিল, চোখ রাঙিয়ে বার বার বলেছিল,—তোমার কর্তব্য ভুলে যেও না। বাবা-মা তোমাকে অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন। তাঁদের ঋণ শোধ কর।

বিবেকের ওপর পাষাণ চাপা দিল হানিফ। কারণ তার অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে, বিবেককে হত্যা না করলে কোন দিন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া যায় না। যার বিবেক যত বেশি সজীব, এ সংসারে সে-ই তত বেশি দুঃখ পায়, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করে।

দুধের কথা ছেলে-মেয়েরা ভুলে গেছে কারণ অনেক দিন আগে থেকেই দুধ কেনা ছেড়ে দিয়েছে হানিফ। বারো আনা এক টাকা সেরের দুধ। মাথা পিছু এক পো করে কিনলেও মাইনের অর্ধেক নিয়ে টান দেবে। স্ত্রী মাঝে মাঝে অনুযোগ করে। তাকে সে বুঝিয়ে বলে,—তিন পো পানিতে এক পো দুধ, তার সের এক টাকা। পয়সা দিয়ে পানি কিনতে যাব, এত বোকা হয়েছি আমি ? ভাতের ফেন এর চেয়ে অনেক বেশি পুষ্টিকর। অনেক ভিটামিন আছে তাতে।

বড় দুটোকে ফেনই দেয়া হচ্ছিল। আর কোলেরটাকে চালের গুঁড়োর মণ্ড। ফেন দিয়ে ভাত মেখে মজিদ ও জমিলা যখন পরম তৃপ্তির সাথে খায়, তখন হানিফ চেয়ে দেখে আর ভাবে, তার কোন অভাব নেই। সে সুখী।

ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে হানিফ একটুও ভাবে না। বড় ছেলে-মেয়ে দুটো ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে পড়ছে। সরকারী খরচে নাম আর নামতা গোনা পর্যন্ত শিখলেই হল, তার বেশি নয়। তার বেশি পড়বার খরচ যোগাতে পারবে না—সে জানে। তথাপি এটাকে কারণ বলে স্বীকার করতে রাজী নয় সে। কারণ হচ্ছে—বেশি পড়লেই ছেলেগুলোর চোখ খুলবে, ভ্রু কুঁচকাবে, বড় চাকরির দূরাকাঙ্ক্ষা করবে। কোন মতে একটা বড় চাকরি যদি জুটে যায় কারো, তবে তার আকাঙ্ক্ষার পাখি খুশিমত উড়তে না পারলে খালি হায়-আফসোস করবে—অমুকের তমুক জিনিসটা আছে, তার কেন থাকবে না ? অমুকে সর্বাধুনিক মডেলের তমুক জিনিসটা কিনেছে, তার জিনিসটা বড্ড কদাকার। অমুক জিনিসটা না হলে ইজ্জত বাঁচে না।

এসব ভোগ-বিলাসের 'রেস' খেলায় অঢেল টাকার দরকার। মাইনের টাকায় পোষাবে না। তাই বলে টাকার কি আর অভাব আছে ? টাকারা তো 'কিউ' দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। কলমের খোঁচায় পথ তৈরি হলেই তারা সুড়-সুড় করে চলে আসবে। আর যদি কম মাইনের চাকরি জোটে, তবে মান-মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে অথবা বাজারদরের সাথে তাল মেলাবার জন্যে তাকেও কলমের খোঁচার কলা-কৌশল শিখতে হবে, আর বাঁ হাত বাড়াতে হবে টেবিলের তলা দিয়ে। তারপর হয়তো কোনদিন দুর্নীতি-দমন বিভাগের দাওয়াত নিয়ে লাল-ঘরের অতিথি হবে। তাই, হানিফের মত হচ্ছে—অধিক বিদ্যা ভয়ঙ্করী, অল্প-বিদ্যা শুভঙ্করী।

সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা কোথায় থাকেন, কি খান এ সব হানিফ খোঁজ করে না। কারণ তাঁদের বপু আর তার তনু এক নয়। তাঁদের ভুঁড়ির জুড়ি তার পেটের পটুতা নয়। তার জিভ তাঁদের রসনার মত রসিক নয়। এ জন্যই সে তার কৌতুহলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ সে বুঝে নিয়েছে—কৌতূহলী মন বিকারগ্রস্ত।

হানিফ আরো বুঝে নিয়েছে—অভাবের অনুভূতি একটা রোগ বিশেষ। তাই কোটের বদলে কাঁথা, কোঠার বদলে কুঁড়ে, গাড়ির বদলে গাড়ির টায়ারের স্যান্ডেল পেয়েও সে

সুখী। যদি ক্বচিৎ কখনো তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে কোন অভাবের কথা শোনা যায়, তখন তাকে মহাপুরুষদের অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের কাহিনী শোনায় সে।

স্ত্রীর মুখ দিয়ে আর টু শব্দটি বার হয় না। স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী-ই বটে।

হানিফের সংসার ভালো ভাবেই চলছে। সে অফিসে দশটা-পাঁচটা করে, আর তার স্ত্রী বাসায় পাঁচটা-দশটা করে। খুশির খবর এই যে,—পে কমিশন-এর সুপারিশে বিশ টাকা মাইনে বেড়েছে। আরো খুশির খবর, এই বিশ টাকার ভাগীদারও দুটি এসেছে।

মুন্সিগঞ্জ
৬ পৌষ, ১৩৫৮ ডিসেম্বর, ১৯৫১

দাদীর নদীদর্শন

নদী যে দেশের শিরা-উপশিরা, সে দেশের অনেক মানুষ নদী দেখেনি। কথাটা শুনতে যেন কেমন লাগে। আজব শোনালেও এ কথার ভিতর এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই। অনেকের কথা বাদ দিলেও একজন সম্বন্ধে এ কথা জোর দিয়েই বলা চলে। ইনি রাজাপুরের মীরহাবেলীর মৌলবী দাদী। ষাট বছরের ওপর বয়স হয়েছে, তিনি নদী দেখেননি। অথচ এ বাড়িরই ছেলে কামাল সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে এসেছে।

দাদীর নদী না দেখার কারণ আছে বৈকি। ছ'হাত উঁচু দেয়াল-ঘেরা এ মীরহাবেলী তাঁর বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ি। তাই কৈশোরের পর তাঁকে এ দেয়ালের বাইরে যেতে হয়নি কোন দিন। মীরহাবেলীতে মৌলবী দাদী বলে একজন আছেন, এটুকুই বাইরের লোকে জানে। তারা কেউ তাঁকে কখনো চোখে দেখেনি। দেখবে কেমন করে ? গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনি ভুলেও একবার বাড়ির বৈঠকখানায় ঢোকেননি। এ বড়িতে যারা বউ হয়ে এসেছে, পর্দার কড়াকড়িতে তাদের শ্বাসরোধ হওয়ার যোগাড়। দাদীর চোখ-রাঙানির ভয়ে মীর খানদানের পর্দার মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ন করতে সাহস হয়নি কারো।

দাদীর পর্দানিষ্ঠার অনেক কাহিনী উপমা হিসেবে মোল্লা-মৌলবীরা তাঁদের ওয়াজে বয়ান করে থাকেন। গাঁয়ের লোক এসব কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

একদিনের ঘটনা। দাদী চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। সেটা দাদীর কাঁচা চুলের যুগ। বিয়ে তখনো হয়নি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খালি মাথায় তিনি সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চাচাত ভাই মীর আদিল ঐ অবস্থায় তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন। জানতে পেরে দাদী মাথা ন্যাড়া করে ফেললেন তক্ষুণি। পর-পুরুষের দেখা চুল রাখতে নেই, রাখলে প্রত্যেকটা চুল সাপ হয়ে কামড়াবে হাশরের দিন। মীর আদিলও ছিলেন একগুঁয়ে লোক। শুনে তাঁর রোখ চেপে গেলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, বিয়ে ওকে করা চাই-ই চাই। বিয়ে শেষ পর্যন্ত করে তবে ছেড়েছেন তিনি। বাসর-রাতে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বামীর প্রথম কথা কি ছিল, কারো জানবার কথা নয়। তবে অনুমান করা যায়, স্বামী হয়তো বলেছিলেন,—এবার দেখব কতবার মাথা ন্যাড়া করতে পার তুমি।

শোনা যায় আর একবার তাঁকে মাথা ন্যাড়া করতে হয়েছিল। টাইফয়েড হয়েছিল সেবার। সদর থেকে বড় ডাক্তার এলেন বাড়িতে। খবরটা তাঁর ঘরে দিয়ে গেল এক বাঁদী। আধা হুঁশ অবস্থায় কথাটা তাঁর কানে গেল। তিনি আচমকা উঠে বসলেন। বাঁদীকে হুকুম করলেন,—দরজা বন্ধ কর।

বাধ্য হয়ে ডাক্তারকে ফেরত দিতে হল। তারপর এলেন মেয়ে-ডাক্তার। পরীক্ষা করে তিনি রোগ নির্ণয় করলেন। কিন্তু বিপদ এবার আরো ঘোরালো হয়ে উঠ্‌ল। দাদী ডাক্তারী অষুধ খান না। ওতে কি না কি আছে, বলা যায় না তো ?—হারাম জিনিস ছাড়া নাকি অষুধই হয় না। তাঁকে অনেক বোঝান হল, শিশুদের মত চামচে করে মুখে ঢেলে দেয়ার চেষ্টাও হল কয়েকবার। কিন্তু গলার ভেতরে অষুধের এক ফোঁটাও গেল না। নিরুপায় হয়ে হেকিম আনা হল। কিন্তু তাঁরও তো আবার 'প্রবেশ নিষেধ'। ডাক্তার আর হেকিম দু'জনে আলোচনা হল। ডাক্তারের কাছ থেকে রোগের বিবরণ জেনে হেকিম দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। রোগ সারতে অনেকদিন লাগল। কোনরকমে বেঁচে গেলেন সে যাত্রা। তারপর গোছায় গোছায় চুল উঠতে আরম্ভ করল। কিন্তু চুল উঠবার কারণ কি ? দাদীর সন্দেহ হল, নিশ্চয়ই বেগানা কেউ দেখে ফেলেছে যখন তাঁর জ্ঞান ছিল না অসুখের সময়।

অষুধের মত অনেক কিছুই দাদী খান না। যেমন প্যাকেট করা বিস্কুট, কৌটোয় ভরা মাখন, লেবেল-লাগান বোতলের চাটনী, মোরব্বা, জেলী আরো কত কি! তাঁর মতে এগুলো সব বিলেতী। নাম-না-জানা চকমকে ঝলমলে নতুন কিছু হলেই সেটা বিলেতী এবং হারাম। তিনি নিজে তো খানই না, আর কারো খাওয়াও পছন্দ করেন না। একদিন কামালের ছোট ভাই জগলু চকোলেট মুখে পুরে তাঁর ঘরে গিয়েছিল। চকোলেটের রঙিন কাগজটা ওর হাতে। ওর মুখনাড়া দেখে সন্দেহ হল তাঁর।

—কিরে, কি খাস ?

—চকোলেট।

—চকোলেট। সেইটা আবার কি নিয়ামত ?

নামটা অপরিচিত। সুতরাং বিলেতী না হয়ে যায় না। তিনি খপ করে জগলুর হাত ধরে ফেললেন।

—এই ফ্যাল্। ফ্যালাইয়া দে ওটা। বাড়িটায় হারামখোর জুটেছে যতসব! দীন-ধর্ম আর রাখল না। ফ্যাল, ফ্যালাইয়া দে।

জগলুর মুখে তখন চকোলেটের স্বাদ জমে উঠেছে। এ অবস্থায় ওটা মুখ থেকে ফেলা তার পক্ষে অসম্ভব। সে জোর করে মুখ বুঁজে রইল।

দাদী ওর মুখে আঙ্গুল দিয়ে চকোলেটটা বের করে ফেলে দিলেন। জগলু হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল। কান্না শুনে কামাল এসে ওকে ঘরে নিয়ে গেল। ওর কান্না থামাতে দিতে হল দুটো চকোলেট। চকোলেট দুটো দু'গালে পুরে চলল আবার দাদীর ঘরের দিকে। এবার বাইরে থেকে দাদীর দন্তহীন মুখের পান চিবানো ভঙ্গি নকল করে ডাকলো, —ও-ও বুড়ি, বুড়ি, খাবে ? সাথে সাথে জোরে চোঁ চোঁ করে চুষতে লাগল চকোলেট নির্ভয়ে। পাঁচ বছরের জগলুও জানে দাদীর দৌড় ঐ দোর-গোড়া পর্যন্তই।

মীর-গৃহে গৃহ-বিবাদ হয়েছে অনেকবার। এই বিবাদকে দাদী বলেন জেহাদ। জেহাদ হয়েছে ছেলেদের ইংরেজি পড়া নিয়ে, গ্রামোফোন-রেডিও বাজানো আর দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো নিয়ে। দাদী তাঁর দলবল নিয়ে বাধা দিতেন। সুবিধে না হলে কথা বন্ধ বা

কখনো কখনো দরজা বন্ধ আন্দোলন শুরু করতেন। দাদী বাড়ির মেয়ে মহলের একচ্ছত্র নেত্রী। বাড়ির মেয়েরা তাঁকে ভয় করে, ভক্তি করে। তাঁর নেত্রীত্বের ওপরে তাদের আস্থা অসীম, অটল। পুরাতন দিনের রীতি-নীতি আচার-আচরণ তিনি সদলবলে আঁকড়ির মত ধরে আছেন। তাঁর মতে পুরোনো সবকিছুই ভালো। তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলেন, —সেই সোনার দিন কি আর আসবে? সেই দিনই নাই, দুনিয়াও নাই। সব পাপে ছাইয়া গেছে। দুনিয়াদারী শেষ হইয়া আসছে। কিয়ামতের আর দেরি নাই।

দাদী অনেক জেহাদ ফতে করেছেন। মদিনা মনওয়ারা ও কাবাশরীফের তস্‌বীর ছাড়া মীরহাবেলীর কোন দেয়ালে একখানা ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছবির ওপর চোখ পড়লে নাকি ওজু নষ্ট হয়। তাঁর ভয়ে হাবেলীর চৌসীমানার মধ্যে কেউ রেডিও-গ্রামোফোন বাজাতে সাহস করে নি কোনদিন। তাঁর এক নাতি আলমগীর একটা রেডিও কিনে এনেছিল। দাদীর ফৌজের হাতে সেটার দফা ঠাণ্ডা হয়েছিল আর একটু হলেই। আলমগীর রেডিওটা মাথায় নিয়ে দে দৌড়। হাঁপাতে হাঁপাতে সে ক্লাবঘরে গিয়ে উঠেছিল। হাবেলী থেকে অনেক দূরে ক্লাবঘর। সেখানেই এখন রেডিও বাজে।

একবার মেঘের জন্যে ঈদের চাঁদ দেখা গেল না। রেডিওর ঘোষণা শোনা গেল—বোম্বাইয়ে চাঁদ দেখা গেছে, কাল ঈদ।

খবর শুনে দাদী বললেন,—কাল ঈদ! তোমরা চাঁন দেখছ?

—না।

—তবে?

—বেম্বাইতে চাঁন দেখা গেছে। রেডিওতে খবর আসছে।

—রেডুতে! না রেডু-ফেডুর খবর মানি না। রেডু হইল শয়তানের কল। ওর মইদ্যে শয়তান বইসা বইসা কথা কয়। শয়তানই এই খবর দিছে ইনসানকে দাগা দিবার জন্য।

মীরহাবেলীতে ঈদ হল ঈদের পরের দিন।

মীরহাবেলীর মেয়েদের ইংরেজি তো দূরের কথা, বাঙলা পড়বারও অধিকার ছিল না। মৌলবী দাদীর ফতোয়া লঙ্ঘন করে কার এমন বুকের পাটা! তাঁর মতে ওগুলো সব কুফরী এলেম। আরবী অক্ষর চিনে কোরান শরীফ পড়তে পারলেই যথেষ্ট। অর্থ বুঝবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর ফতোয়া শোনা যায় নি কখনো। তবে মেয়েদের এভাবে তোতার বুলি শেখালেও ছেলেদের তিনি মাদ্রাসায় পাঠাতে পারেন নি। মেয়েদের চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করে রাখলেও ছেলেরা বেরিয়েই পড়েছিল। তাঁর পুতের ঘরের নাতি কামাল তো বিলেতই ঘুরে এল।

বিলেত যাওয়ার দিন দাদীর কাছ থেকে বিদায় নিতে পারে নি কামাল। দাদী সেদিন তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল না, কামাল বিলেত যায়। বিলেতী জিনিসের ওপর যাঁর এত বিদ্বেষ, বিলেতের ওপর তাঁর মনোভাব যে কেমন হবে, সহজেই বোঝা যায়।

বিলেত থেকে এসেও যে দাদীর সাক্ষাৎ পাবে, ভরসা ছিল না কামালের। সে দাদীর ঘরের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। সুমুখে বাঁদীকে পেয়ে বলে,—মধুর মা, দাদীকে বলোগে, তাঁর সাথে দেখা করতে চাই।

দাদীর সাথে দেখা করতে নাতিদেরও অনুমতি নিতে হয়।

দাদী বসে বসে তসবীহ্ জপছিলেন। মধুর মা এসে খবর দেয়,—বড় আম্মা, মাইজ্যা সাবের বড় পোলা আপনার লগে দ্যাখা করতে আইছে।

—কে ? কামাল ? তুই কারে দেইখা কার কথা কইতে আছস ?

—উঁহু, আপনে দেখেন গিয়া।

—দুও বেটি। সেই দিন তো মাত্র ওর চিঠি আসলো। বিলাত কি আর দুই-চার মাসের পথ! মক্কাশরীফ যাইতে তো ছয় মাস লাগে।

দাদী আর তাঁর সেজবউ-এর মধ্যে কথা হচ্ছিল একদিন। দাদী বলেছিলেন,—মক্কাশরীফ যাইতে ছয় মাস লাগে। সেজবউ বলেছিলেন,—আমার বাবা আমগাছে বোল দেখে মক্কাশরীফ যাত্রা করেছিলেন, আবার হজ করে এসে বোশেখী খেয়েছেন।

দাদী বলেছিলেন,—বিশ্বাস করি না। তোমার বাবা বৈশাখী খাওয়ার লেইগ্যা আধা পতের থিকা ফিরা আসছিলেন।

মধুর মা তাগিদ দেয়,—তারে আসতে কইমু, বড় আম্মা ?

—না, আগে নাম জিগাইয়া আয়।

মধুর মা নাম জিজ্ঞেস করে আসে। শুনে আশ্চর্য হন দাদী! তিনি তসবীহ হাতে দাঁড়ান। দরজা বন্ধ করতেই এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু দেখেন পাজামা-শেরওয়ানী পরে, টুপি মাথায় দিয়ে কামাল দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর স্বামী মীর আদিল এ পোশাক পরেই চলাফেরা করতেন। দরজা আর বন্ধ হল না। তিনি এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন,—কামাল, আয় ঘরে আয়।

ঘরে ঢুকতেই দাদী বলেন,—কি রে একা যে, মেমসাব কই ? আমি তো ভাবছিলাম—

নতজানু হয়ে কদমবুসি করায় তাঁর কথায় বাধা পড়ে।

—থাউক, থাউক লাগব না আর। বাঁইচ্যা থাক। খোদায় বাঁচাইয়া রাখুক।

তার ঘরে গিয়ে বসে কামাল। তার আম্মা, চাচীআম্মা, আরো অনেকে এলেন।

দাদী বলেন,—এত তাড়াতাড়ি ক্যাম্‌নে আসলি ? এই তো মাত্র ছয়-সাত দিন আগে তোর চিঠি পইড়া শোনাইল তোর আব্বাজান।

—ঐ দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তাই উড়ে এলাম প্লেনে—উড়ো জাহাজে।

তড়াক করে দাদীর মাথার ভেতর যেন ঘুরপাক শুরু হয়ে গেল। ওপর থেকে ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, এমনি একটা ভাব। একটু সামলে নিয়ে বলেন,—মাগো মা, উড়ো জাহাজ! ডর করল না ? আমার তো ভাই দোতলার তন্ নিচে মাটির দিগে চাইলে কলিজা কাঁইপা ওঠে। মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ ভোমরা ডাকতে থাকে। তখন আর খাড়া থাকতে পারি না।

—আপনাদের তো ওরকমই। দুনিয়ার কিছু দেখলেন না, কিচ্ছু শিখলেন না। জানেন দাদীআম্মা, ওদেশের মেয়েরা উড়ো জাহাজ চালায়।

দাদীর সাথে এভাবে কথা বলতে ভালো লাগে কামালের। তাঁর উত্তর শুনে হাসি আসে, আমোদ পাওয়া যায়।

—ওই সব বে-দীন আওরতের কথা কইস না আমার কাছে। ওদের তো আর আল্লা-খোদা নাই—মইরা গেলে ফেরেশতারা যখন গুর্জু দিয়া পিটাইব, তখন বুঝব কেমন মজা।

—কেন ? তুরস্কের মেয়েরা তো মুসলমান। তারাও তো আজকাল উড়ো জাহাজ চালায়।

অবাক হয়ে শুনছিলেন দাদী। ভাগ্যিস তিনি খবর রাখেন না। খবর রাখলে নিশ্চয়ই বলতেন,—সেই জন্যেই তো খোদার গজব নাজিল হইছে, ভূঁইকম্পে রসাতল কইরা নিয়া গেছে দেশটারে।

আশ্চর্যের ভাবটা কেটে গেলে দাদী বলেন,—খোদার সঙ্গে কি রকম আড়ি লাগাইছে, দ্যাখো। মানুষ আসমানে উড়তে যাইব ক্যান্ ? আসমানে উড়বার জন্যে খোদা পাখী পয়দা করছেন, তার পাখনা লাগাইয়া দিছেন।

কামালের মা বলেন,—কতই শোন্‌লাম, আর কতই শোনতে হইব! ছবিতে নাকি আবার কথা কয়! কি সব শেরেকী কারবার। কিন্তু আমি কই, কথা কওয়াইলে কি হইব ? রুহ্ তো আর দিতে পারে না। খোদার লগে আড়ি দিলেই হইল!

মৌলবী দাদী নদী দেখেন নি। এবার নদীই এসেছে তাঁর কাছে দর্শন দিতে। দু'মাইল দূরে ছিল যে পদ্মা, ভাঙতে ভাঙতে সে এখন মীর হাবেলীর কাছাকাছি এসে গেছে। সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। দু'শো বছরের পুরাতন জরাজীর্ণ হাবেলী পদ্মার শোঁ-শোঁ আওয়াজ শুনে কাঁপছে থরথর করে।

নদীর উত্তর পারে বাড়ি ঠিক হয়েছে। সেখানে রাতারাতি টিনের ঘর ওঠে গেছে কয়েকটা। মীরহাবেলীর লোকজন নৌকা করে নতুন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে।

দাদীর যাবার সময় হয়েছে। পালকি আসে তাঁর ঘরের দরজায়। তিনি উঠলে পালকির দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। অল্প দূরে নদী। পালকি এনে নামান হয় পানসিতে, পালকি আর পানসির দরজা এক করে। দাদী নৌকার খোপে ঢোকেন। দরজা বন্ধ হয়।

ভাদ্র মাস। পদ্মা অসম্ভব ফুলে উঠেছে। দুই পার ডুবে যাওয়ায় ধু-ধু দেখা যায় অন্য পার। দাদী তাঁর ঘোলাটে বুড়ো চোখ মেলে তাকান খিড়কির পর্দা ফাঁক করে। ভয় ও বিস্ময়ের ছাপ তাঁর চোখে মুখে। বলেন,—এত পানি! খোদার কি কুদরত! এত পানি কোনখান থিকা আসে, আবার কোথায় যায়, খোদা ছাড়া কেউ জানে না।

সেদিন তেমন হাওয়া ছিল না। পানসিখানা এগিয়ে চলছে মৃদু ঢেউএর তালে তালে। আশেপাশে ইলিশ মাছ ধরার ছোট ছোট নৌকাগুলো দোল খাচ্ছে অবিরাম।

দাদী আর চাইতে পারেন না। তাঁর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ওয়াক—ও—ও—য়াক!

কামাল ছৈ-এর বাইরে ছিল। শব্দ শুনে সে খোপের ভেতর যায়।

—এ কি! দাদী বমি করে দিয়েছেন!

সমুদ্রপীড়া সম্বন্ধে কামালের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু নদীতে এ রকম হয়, সে শোনে নি তো! আর ঢেউও তো তেমন নেই এখন।

দাদীকে তাড়াতাড়ি ধরে শুইয়ে দিতে দিতে আরো বার দুই বমি হয়। তাঁর অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যায় কামাল। নৌকা জোরে চালাবার জন্যে সে মাঝিদের তাড়া দেয়।

কামাল পাখা করতে থাকে, আর দাদীর তুলোর মত সাদা চুলের মাঝে আঙুল চালায় বাঁদী।

আরো বার কয়েক বমি করেন দাদী। ভোরে যা খেয়ে বেরিয়েছিলেন, সবই যায় বেরিয়ে। অ-চিবানো আস্ত ভাতগুলো বিছানায় পড়ে ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে।

ওপারের ঘাটে পানসি ভিড়ে। কোন রকমে তাঁকে পালকিতে তুলে নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরাধরি করে যখন তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়, তখন তাঁর হুঁশ নেই।

দাদীর নদীদর্শন এখানেই শেষ হয়। কিন্তু এ নদীদর্শনই কাল হয় তাঁর। ঐ দিনই আছরের নামাজের পর দাদী ইন্তেকাল করেন।

নারায়ণগঞ্জ
১১ অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ নভেম্বর, ১৯৪৫

পণ্ডশ্রম

আলমারির নাভিতালায় চাবি ঢুকাই। কিন্তু সবটা ঢুকছে না যে! জোরে চাপ দিতেই কি যেন ভেদ করে চাবি ঢোকে, টের পাই। কিন্তু এবার আবার চাবি ঘুরছে না। জং ধরে গেছে বোধ হয় তালায়। দারোয়ান কেরোসিন তেল নিয়ে আসে। তেল দিয়ে কিছুক্ষণ রাখার পর চাবি ঘোরে। আলমারির কবাট খুলে দেখি, ভিতরে নাভিতালা জুড়ে এক কুমোরে পোকার বাসা। ওহ্ হো, এ জন্যেই চাবি ঢুকছিল না!

আমাদের ক্লাব-লাইব্রেরি আলমারি। ইংরেজি গল্প-উপন্যাস কেউ পড়ে বলে মনে হয় না। বহুদিন না খোলার দরুন তালার ফুটো দিয়ে কুমোরে পোকা ঢুকে নির্ভাবনায় বাসা বেঁধেছিল।

ইংরেজি গল্প-উপন্যাস কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব যখন ঘাড়ে নিয়েছি তখন বই-পুস্তকের যত্ন আমাকে নিতেই হবে। বইগুলো ঝেড়ে মুছে ডি-ডি-টি গুড়ো ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে দারোয়ানকে নির্দেশ দিই।

বাঙলা গল্প-উপন্যাস ভালো হোক, মন্দ হোক, লোকে দেদার পড়ে। দু'দিন আলমারিতে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু ইংরেজি গল্প-উপন্যাস পড়ে না কেন লোকে। উত্তর পাই কবির ভাষায় :

'নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?'

একমাত্র স্বদেশী ভাষায়ই মানুষের আশা পূর্ণ হয় এ আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি। কারণ বিদেশী ভাষা অনেকবার আমার আশা ভঙ্গ করেছে।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়—

সে অনেক দিন আগের কথা। বিশ টাকা মাইনের একটা চাকরির জন্যে তখন হাজার গ্রাজুয়েট লাইন ধরত। চাকরির সেই দুর্ভিক্ষের বাজারে কলেজের পাঠ চুকিয়ে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখছি আর দরখাস্ত পাঠাচ্ছি সরকারী-বেসরকারী অফিসে, যেখানে গিয়ে লাগে। কিন্তু লাগল না। হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে থাকতে অনেক দিন পরে একটা 'ইন্টারভিউ কার্ড' পেলাম। স্যুট-টাই ধার করে সায়েব সেজে 'স্মিথ এন্ড কোহেন লিমিটেড'-এর অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। সিলেকশান বোর্ডে তিন জন খাস বিলেতী সায়েব। যথাসম্ভব চটপটে হওয়ার চেষ্টা করে ভেতরে ঢুকলাম।

—গুড মর্নিং স্যার।

আমার অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে 'মর্নিং' বলে একজন সায়েব কি যে জিজ্ঞেস করলেন, বুঝতে পারলাম না। এ কি ইংরেজি ভাষা ? কিন্তু স্কুল-কলেজে যাদের কাছে ইংরেজি শিখেছি, তাঁদের মুখে এ রকম ইংরেজি তো কখনও শুনি নি।

বুঝতে না পেরে বললাম,—বেগ ইত্তর পার্ডন ?

আবার বললেন, কিন্তু মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

—পার্ডন ?

এবার আর একজন বললেন একটু গলা চড়িয়ে। কিন্তু সেই 'হটিশ্‌টিফটিশ্‌টিও বুঝতে পারলাম না।

—পার্ডন ?

এবার আর অন্যজন বললেন। কিন্তু কত আর মাপ চাওয়া যায়। এ বার চুপ করে অসহায়ের মত হা করে তাকিয়ে আছি। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা আমার।

—টুমি ইংলি জানে না। টুমিকে হামাডের ডারকার আছে নাই। টুমি যেটে পারে।

বেরিয়ে বাঁচলাম। রীতিমত ঘাম দিয়েছিল আমাকে। আমার অবস্থা শুনে অনেকেই হয়তো হাসবেন। কিন্তু আমার মত অবস্থা আরো অনেকেরই হয়েছে, তাদের নিজেদের মুখে শুনেছি।

সায়েব যে বললেন, আমি ইংরেজি জানি না, চোদ্দ বছর কি শিখলাম তবে ?

এ প্রশ্ন আমার মনে আরো বহুবার জেগেছে এবং এখনো জাগে। এ প্রশ্ন জাগে, যখন ইংরেজিতে চিঠি, দরখাস্ত লিখবার সময় সঠিক 'প্রিপজিশন' বসাতে গিয়ে মাথা চুলকাই। এ প্রশ্ন জাগে, যখন ইংরেজি উপন্যাস পড়তে গিয়ে অচেনা শব্দের জন্যে বার বার অভিধান হাতড়ে হয়রান হই। এ প্রশ্ন জাগে, যখন ইংরেজি ছবি দেখতে গিয়ে সংলাপের বারো আনাই বুঝি না এবং দর্শক সায়েব-মেম ও তাদের ছেলে-মেয়েদের হাসির রোল শুনে হাসির কারণ খুঁজে ব্যর্থ হই।

চোদ্দ বছর ধরে মাতৃভাষার চেয়ে অন্তত চারগুণ সময় আর শ্রম খরচ করেছি ইংরেজি শিখতে। তারপর আরো ষোল বছর ধরে ইংরেজির মাধ্যমে অফিসে কাজ করে যাচ্ছি। এত করেও ইংরেজি ভালো রপ্ত হয়নি—স্পষ্ট বুঝতে পারি। আরো বুঝতে পারি—বিদেশী ভাষা মাতৃভাষার মত সোজাসুজি বোধগম্য হয় না। মাতৃভাষায় তর্জমা হয়ে তারপর বোধগম্য হয়। অর্থাৎ টাডি সুপারীর মত জাঁতির জাঁতা খেয়ে তারপর দাঁতের তলায় যায়। বিদেশী ভাষার কথন-পঠনে যিনি যত বেশি অভ্যস্ত, তার মগজের মধ্যে তর্জমার প্রক্রিয়াটাও হয় তত তাড়াতাড়ি।

ইংরেজি ভাষায় এই যে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করছি, এতে এতটুকু লজ্জা আমার নেই। কারণ মানুষ স্বীকার করে কখন ?—ধিক্কার আসে যখন। বিদেশী ভাষার বোঝা মাথায় নিয়ে হোঁচট খেয়ে খেয়ে ধিক্কার এসে গেছে।

অনেকের বোধ হয় এ ধিক্কার আসেনি। চোখের সামনেই রয়েছেন একজন—আমাদের অফিসের আনসার আলী বি.এ.। নামের শেষের ডিগ্রীটা তাঁর এতই প্রিয় যে,

এ ডিগ্রী প্রেমের নমুনা তাঁর বাসার নাম-ফলক, চেয়ার, টেবিল, তাক, দোয়াতদানি মায় বদনাটিতে পর্যন্ত জাজ্বল্যমান। আমরাও তাই তাঁর এ প্রেমে কখনো বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইনে।

আনসার আলী বি.এ.-র ভাবসাব দেখে মনে হয়—তাঁর কাছে ইংরেজি ভাষার বোঝা তাঁর মাথার ফেল্ট হ্যাট্‌টার চেয়ে ভারী নয়। নামটা মনে পড়তেই 'ইস্যু রেজিস্টার' খুলি। আনসার আলী বি. এ.-র নামের পাতাটা বের করে দেখি—এ পর্যন্ত তিনি একখানা ইংরেজি বইও লাইব্রেরি থেকে নেননি। অথচ বাঙলা নাটক, উপন্যাস এমন কি ডিটেকটিভ উপন্যাসও অনেক নিয়ে পড়েছেন। ইংরেজির এত বড় ভক্ত বাঙলা বই পড়েন, এ যে বিশ্বাস করা যায় না!

বেশি নয়, মাস ছয়েক আগের কথা, রেডিওতে রাত পৌনে ন'টার খবর শুনবার জন্য ক্লাবে বসেছিলাম আমরা কয়েক জন। খবর বলা শেষ হলে জাহিদ বলে,—যাক, বাঙলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে, প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

আনসার আলী বি. এ. ভ্রূ কুঁচকান। ভ্রূ কুঁচকাবার কারণ খুঁজতে বিলম্ব হয় না। তিনি নাক সিটকে বলেন,—হুঁ হু, বাঙলা একটা ভাষা, সেটা হবে রাষ্ট্রভাষা।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাই। জাহিদ বলে ওঠে,—কেন ? বাঙলা ভাষা আপনার পছন্দ নয় ?

—পছন্দ হবে কি সায়েব ? বাঙলা ভাষায় আছেটা কি ?

—কি নেই, তাই আগে বলুন ?

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের কোন বই আছে ? মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একখানা বইও বাঙলায় বেরিয়েছে এ পর্যন্ত ?

—উর্দুতে বেরিয়েছে ? জাহিদের পাল্টা প্রশ্ন।

—না, উর্দুর সমর্থন আমি করছি না। আমি ইংরেজির ভক্ত। আনসার আলী বি.এ. বলেন।

—ও বুঝলাম। বাঙলায় ওসব বই নেই স্বীকার করি। কিন্তু এতদিন কেন বাঙলা ভাষায় এসব বই হয় নি, এ-তো খুবই স্পষ্ট। বাঙলা ভাষায় এসব বই হলে সে বই পড়াত কোন বিশ্ববিদ্যালয় ? শিক্ষার মাধ্যম বাঙলা হোক, তারপর দেখবেন।

—না, ও কোনদিন হবে না, হতে পারে না। আনসার আলী বি. এ.-র সমর্থনে আনোয়ার বলে।

—হতেই হবে। না হলে এদেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তর্কে যোগ দিলাম আমিও।

—কেন ? আনোয়ার বলে।

—কারণ ইংরেজি ভাষা শিখতেই আমাদের দম ফুরিয়ে যায়। তারপর হাঁপিয়ে-ওঠা দম নিয়ে সমুদ্রের তলায়ও যাওয়া যায় না, মুক্তাও তোলা হয় না। শেওলা কুড়িয়ে ভেসে উঠতে হয়।

—মাহমুদ সায়েব ঠিক বলেছেন। জাহিদ আমাকে সমর্থন করে বলে।—মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা কত সহজ। কথা বলায় কত স্বস্তি।

—নাহ্, আমার কাছে বরং অস্বস্তি লাগে। আনসার আলী বি. এ. বলেন।

—কি রকম ?

—বাঙলা শব্দে এক্সপ্রেশনই হয় না ঠিক মত। এই যে ধরুন Put up কথাটা অফিসে অহরহ ব্যবহার করছি : Put up so and so file. বাঙলায় এর প্রতিশব্দ কি হবে ?

—প্রতিশব্দ কি হবে, তা' আমাদের পণ্ডিতেরা বুঝবেন। পরিভাষা অবিশ্যি তৈরি করে নিতে হবে।

কোণের টেবিল থেকে নূরুল ইসলাম হঠাৎ বলে ওঠে, 'Put up' কথাটা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। নতুন কেরানি। সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করে চাকরি পেয়েছে। তার অফিসার বলেন,—অমুক ফাইলটা Put up করবেন। তিন-চার দিন পরে অফিসার তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,—কই আপনি ফাইলটা Put up করলেন না তো ?

—করেছি তো, স্যার!

—কই ? না! আমি দেখিনি তো!

—ঐ তো স্যার, ঐ রুমে আলমারির ওপরে পুট আ-প করেছি।

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। আনসার আলী বি.এ.-ও হাসিতে যোগ দেন।

তর্কের মোড় ঘুরে যায়। ভুল ইংরেজি বলার গল্প যার তহবিলে যতটা আছে ছাড়তে শুরু করে।

মোবারক বলে,—পাড়াগাঁ-র প্রাইমারী ইস্কুলের এক মাষ্টার। ঢাকা এসে তার শহুরে বন্ধুকে বলে,—শুনেছি, ভিক্টোরিয়া পার্কে নাকি খুব সস্তায় পুরান কোট পাওয়া যায়। চলো না, দেখে দেবে একটা। শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছি।

—কি কোট কিনবে ? শহুরে বন্ধু জিজ্ঞেস করে,—ওভার কোট ?

—না, না, ওভারকোট আবার বেশি লম্বা। 'পেটিকোট' হলেই চলবে।

আবার হো-হো হাসি। এ সময়ে দু'জন জাঁদরেল জমিদারের ভুল ইংরেজি বলার সর্বজনবিদিত গল্প মনে পড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের একজন কোন ব্রিটিশ রাজপুরুষকে নাকি বলেছিলেন,—I shall eat you, Sir অন্যজনও রোদে ঘুরে-আসা কোন শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে বলেছিলেন,—You look bloody Sir.

এ গল্পগুলো হয়তো গল্পই। সত্য হওয়াও বিচিত্র নয়। কলেজে-পড়া লোককে আমি বলতে শুনেছি—ওকে বিশ্বাস করবেন না। লোকটা এক নম্বরের Cheater,—'আপনার Cooker তো খুব ভালো রান্না করতে পারে'—'কেমন আছেন Type-writer সায়েব ?'

—আর এক গল্প। আহমদ সায়েব বলতে শুরু করেন, 'হলপ করে বলছি, বিশ্বাস করুন। আমার এক সহকর্মী। ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন—Two underground terrorists arrested.' হেডিংটা পড়েই আমাকে বললেন,—'আচ্ছা, এই যে শুনি, Underground communists, underground terrorists, এসব লোকগুলো মাটির নিচে থাকে কেমন করে ?'

আবার এক ঝলক হাসি।

আমি চেপে-চুপে ছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু আর পারলাম না। বললাম,—এবার শুনুন আমারটা। আমিও হলপ করেই বলছি। গল্পের নায়ক একজন গ্রাজুয়েট এবং এখানে উপস্থিত।

গল্পের নায়কের উপস্থিতির কথাটা বলা বোধ হয় ঠিক হল না। কারণ আমার গল্প না শুনেই সবাই এ-ওর মুখের দিকে আড়চোখে তাকাতে শুরু করেছে। আমি কারো দিকে না তাকিয়ে বলি,—'আমাদের লাইব্রেরির জন্যে কিছু টাকা মঞ্জুরীর প্রার্থনা করে শিক্ষা মন্ত্রী বাহাদুরকে যে অভিনন্দন দেয়া হয়েছিল, সেটা আমরা কয়েকজনে মিলে মুসাবিদ করি। এক জায়গায় লিখেছি,.....Your august visit.....। অমনি একজন বলে উঠলেন,—আগস্ট কেন লিখছেন ? এটা তো সেপ্টেম্বর মাস।'

হাসির চোটে পেটে খিল ধরে যাওয়ার যোগাড়। এবার সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে আনসার আলী বি.এ.-র ওপর। বেচারার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

আনোয়ার বলে,—খুব তো পরের ভুল নিয়ে হাসাহাসি করছেন। আপনাদের ভুল নিয়েও দেখুন গে কতজন হাসাহাসি করছে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি বলি,—'আমরাও এরকম অজস্র ভুল করি। কিন্তু এই ভুল শেখার চেয়ে না শেখাই ভালো ছিল না কি ? এ পণ্ডশ্রম করে লাভটা কি ? আধা-শেখা ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়ি বলেই তো শিক্ষার সাথে আমাদের আত্মার যোগ নেই।

—সে যা-ই হোক, ইংরেজি ছাড়া এ যুগে চলতেই পারে না।

—কেন ?

—এই ধরুন, বিভিন্ন দেশে আমাদের এমব্যাসি-কনস্যুলেটগুলো। ইংরেজি না হলে এসব কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপনে অসুবিধে হবে কত!

—এমব্যাসি-কসন্যুলেট আর কটা ? এগুলোর জন্যে কয়েক শ' ইংরেজি জানা লোক দরকার। এ জন্যে একটা দেশের সাড়ে চার কোটি মানুষের ওপর বিদেশী ভাষার বোঝা চেপে থাকবে ?

—চেপে থাকবে কেন ? জাহিদ ফোড়ন কাটে।—সাড়ে চার কোটি লোককেই আমরা অ্যামব্যাসাডার, কনসাল করে পাঠিয়ে দেব।

মোবারক খেলোয়াড়। খেলোয়াড়সুলভ একটা উপমা দেয় সে-ও,—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এদেশের সব মানুষকে ধরে অলিম্পিকে পাঠাতে হবে। খোঁড়া-ল্যাংড়া-লুলা কেউ বাদ যাবে না। সবাইকে ধরে ইংরেজির লং জাম্প হাই জাম্প শেখাতে হবে।

আনসার আলী বি. এ. এতক্ষণ 'চুব' খেয়ে ছিলেন যেন। ভেসে উঠে বলেন,—বিদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি হচ্ছে দিন দিন, ইংরেজি না জানলে তার খবরই আমাদের কাছে পৌছবে না।

—কেন পৌছবে না ? বিদেশী ভাষার কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট রাখলেই চলতে পারে।

আমার এক দূর-সম্পর্কীয় মামা প্রবেশ করলে জাহিদের কথায় বাধা পড়ে। মামা এখানে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। বাসা যোগাড় হয় নি বলে আমার বাসায় উঠেছেন।

জাহিদ তার অসমাপ্ত কথার খেই ধরে আবার শুরু করে,—বিদেশী ভাষার কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট রাখলেই চলতে পারে। বেছে বেছে একদল মেধাবী ছেলের কাউকে ইংরেজি, কাউকে ফারসী শিখিয়ে এদের দিয়ে বিদেশী ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইগুলো আমাদের ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিলেই চলতে পারে।

আমাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু কি বুঝতে পেরে মামা বলে ওঠেন,—আমি এখনো ক্লাবের মেম্বার হইনি। আপনাদের আলোচনায় যোগ দেয়া বোধ হয় আমার ঠিক হবে না।

—না, না বলুন। সকলে সমস্বরে বলে।

—আপনারা বোধ হয় সবাই বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষাপাতী। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন বাঁচাতে হলে আমার মনে হয় আরবী—একমাত্র আরবীকেই রাষ্ট্র ভাষা করা উচিত।

—এ সম্ভব নয়। জাহিদ বলে।

—কেন সম্ভব নয়? স্বীকার করি প্রথমে কিছু অসুবিধে হবে। কিন্তু সে সব অসুবিধের দোহাই দিয়ে একটা জাতির আদর্শের বিচার করা চলে না। সমস্ত ভাবালুতা ও পক্ষপাতিত্ব বিসর্জন দিয়ে আরবীকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। কারণ আরবী ভাষা ও হরফ সমস্ত ভাষা ও হরফের জননী।

—জননীকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি হাজার বার। কিন্তু তার মানে এই নয়—জাহাজ ছেড়ে জাহাজ ও নৌকার আদি জননী ভেলায় চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। আমি বলি।

জাহাজ ও নৌকার আদি জননী ভেলা, কে বলেছে? নূহ আলাহেসসালামের কিশ্‌তির কথা কে না শুনেছে? সে কিশ্‌তিতে তামাম জাহানের গাছ-গাছড়ার বীজ, সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পাক্ষীর এক জোড়া করে রাখা হয়েছিল। এ যুগে এ তো বড় জাহাজ একটাও হয়েছে?

প্রশ্নের ঐ দিকে না গিয়ে আমি বলি,—বাঙলা ভাষায় যেভাবে এখন কথা বলতে পারছেন, আরবীতে এ রকম মন খুলে কথা বলতে পারবেন?

—তুমি কি যে বলো? আমার সম্বন্ধে তোমার এ রকম ধারণা! তুমি জানো, আমি ম্যাট্রিকে আরবীতে লেটার পেয়েছিলাম! অথচ বাঙলায় পেয়েছিলাম এক পেপারে সাতচল্লিশ আর এক পেপারে মাত্র উনচল্লিশ।

—বাঙলা বোধ হয় ভালো করে পড়েননি?

—পড়েছি খুবই। কিন্তু ঐ পৌত্তলিকদের ভাষা আমাদের জন্যে নয়, বুঝেছ?

—আরবী বুঝি পৌত্তলিকদের ভাষা ছিল না?

—ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। আর রসূলুল্লাহ্ বলেছেন,—তিন কারণে অরবীকে ভালবাস—আমি একজন আরব, কোরানের ভাষা আরবী এবং বেহেশতের ভাষাও হবে আরবী।

মামা বয়সে মুরব্বি বলে ঠিক নয়, তর্কের বাড়াবাড়িতে হাদিসের বিরুদ্ধাচরণ হয়ে যায় কিনা, এই ভয়ে সবাই চুপ মেরে গেছেন।

আমি শুধু বলি,—কেন, সমস্ত ভাষাই তো খোদার সৃষ্টি।

—সমস্ত ভাষা কেন, সমস্ত মানুষও তো খোদার সৃষ্টি। তবে কেন হিন্দু-বৌদ্ধ-ইহুদী-খ্রীস্টানের চেয়ে মুসলমান খোদার এত প্রিয় ?

রাত দশটা বাজে। আর কথা না বাড়িয়ে মামাকে নিয়ে বাসার দিকে রওনা হই। পথে যেতে যেতে মনে হয়, মামা ঠিক সময়েই এসেছেন। ছোটভাই মতিনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার তিন মাস মাত্র বাকি। আরবী ছাড়া সব বিষয়ে ভালো করবে বলে সে আশা করে। 'জের-জবর-পেশ' না থাকার দরুন আরবী পাঠ্য বই সে পড়তেই পারে না। আমিও যে সাহায্য করব, তার উপায় নেই। ম্যাট্রিক পর্যন্ত যে আরবী শিখেছিলাম, তা সবে ভুলে বসে আছি।

পরের দিন মামাকে বলতেই তিনি আরবী বইতে হরকত বসিয়ে দিতে রাজী হন। আমি বলি,—ডাকি তা হলে মতিনকে ?

—ডাকার দরকার নেই। আমি যাচ্ছি।

মামা মতিনের পড়ার ঘরে যান। আমি পাশের ঘর থেকে মামা ও মতিনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

মামা মতিনকে জিজ্ঞেস করনে,—গ্রামার-ট্রানস্লেশন পড়েছো কেমন ?

—তা ভালোই পড়েছি। কিন্তু 'জের-জবর-পেশ' না থাকায় হেকায়াত ও নযম পড়তেই পারি না।

—পড়তে পারো না! এদ্দিন কি করেছো তবে ? থাক ঠিক আছে। এখন 'হেকায়াত' পড়বার দরকার নেই আর।

—না পড়লে প্রশ্নের উত্তর লিখব কেমন করে ?

'হেকায়াত' আর নযম থেকে দেবে তো শুধু বাংলা তর্জমা করতে। অর্থ বই থেকে বঙ্গানুবাদ একটানা মুখস্ত করে ফেলো। হেকায়াতে তো কোনো অসুবিধাই নেই। যেই দেখবে কামার ও কুকুরের গল্পটা এসেছে, অমনি ঝেড়ে লিখে দেবে। যদি বুঝতে না পারো কোন গল্পটা এসেছে, পাশের কাউকে জিজ্ঞেস করবে আর কাছীদাহ্-র প্রথম লাইনগুলো শুধু চিনে রাখবে। তা হলেই ধরতে পারবে কোন কাছীদাহ্-র বঙ্গানুবাদ লিখতে হবে। ব্যস, হয়ে গেল।

—কিন্তু হরকত ?

—সময় তো মাত্র তিন মাস। এখন হরকত দিয়ে দিলে পড়ে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। যে পথ বাৎলে দিলাম, ঐ মত পড়ে যাও। আর গ্রামার-ট্রানস্লেশন যখন মুখস্ত আছে, তখন চিন্তা কি ?

বইগুলো ঝেড়ে-মুছে আলমারিতে সাজিয়ে রাখছে দারোয়ান। আমি ইস্যু রেজিষ্টারের পাতা উল্টিয়ে চলেছি। আরবী-ভক্ত মামা এ ক'মাসে ক'খানা আরবী বই পড়েছেন দেখবার ইচ্ছে হয়। মামার নামের পাতা বের করি। আরবী ভাষার বই আমাদের বেশি নেই। তবুও আরবী ভাষায় কয়েকখানা হাদিস থাকা সত্ত্বেও মামা মেশকাত শরীফের

বঙ্গানুবাদ, 'হজরতের কথামৃত', 'প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা' নিয়ে পড়েছেন কেন ? একখানা আরবী কিবাতও তো নিয়ে তিনি পড়েন নি এ পর্যন্ত!

পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি ছোটভাই মতিন এসেছে। হাতে একটা কাগজ। ওর উল্লসিত ভাব দেখে জিজ্ঞেস করি,—কিরে ?

—মার্কশীট এসেছে। আরবীতে লেটার পেয়েছি।

হাত বাড়িয়ে মার্কশীটটা নিয়ে দেখি। সত্যিই তো! মতিন আরবীতে লেটার পেয়েছে! কিন্তু, একি! বাঙলায় এত কম! এক পেপারে পঞ্চাশ আর এক পেপারে বায়ান্ন মাত্র।

জিজ্ঞেস করি,—কিরে বাঙলায় এত কম কেন ? তুই না বাঙলায় গপ্‌পো লিখিস ? মুকুলের মহফিলে তা ছাপাও হয় ?

মতিন নিরুত্তর।

—হরকত নিয়ে কসরত না করেই লেটার পেয়েছিস, সাবাস! আমি আবার বলি,—যা, এবার আরবীতে 'হেকায়াত' লিখতে শুরু কর।

৩ রাজার দেউড়ি, ঢাকা
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, জুন, ১৯৫৩

পিপাসা

সোয়েটার বুনতে বুনতে জোহ্‌রা বেগম বলেন,—তারপর ?

—তারপর বিকেল বেলা ম্যানেজার সায়েব বাসায় ফিরে আসেন।

হুঁ—

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে জোহ্‌রা বেগম বলেন,—সাড়ে ছ'টা। হাসান, তোর গল্পটা পরে শুনব। ঢাকা রেডিওতে এ সময়ে বাঙলা গান হওয়ার কথা, দেখি যদি পেয়ে যাই।

রেডিওর সুইচ টিপে মিটারের কাঁটা ২৫·৪ মিটারে ঘোরান জোহ্‌রা বেগম। কোন শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র থেকে ইংরেজি বাজনা ভেসে আসছে। কাঁটাটা আরো একটু ডান দিকে ঘোরান। আরবী না কোন্ এক ভাষায় গান শোনা যাচ্ছে। এবার নরম হাতে এক চুল এক চুল করে বাঁ দিকে ঘোরান কাঁটা। হ্যাঁ, এই তো ভেসে আসছে। সুর শুনে শুধু বোঝা যায় বাঙলা গান, কথা বোঝা যায় না ভালো করে। কেন্দ্রটি একে তো দুর্বল, তা ছাড়া বারোশ' মাইলের ব্যবধান।

দু'দিকের দুটো শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র বড় গোলমাল করছে। গানের কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবু সুরের প্রবাহ মনে-প্রাণে আবেগ জাগায়। সুরের কোমল স্পর্শে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো সুরেলা হয়ে উঠে। জোহ্‌রা বেগম তন্ময় হয়ে শুনছেন। অদূরে একটা চেয়ারের ওপর বসে শুনছে হাসানও।

ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ আসছে ডান পাশের কোন আরবদেশীয় বেতার কেন্দ্র থেকে। বাঁ পাশের কেন্দ্র থেকে ইংরেজি বাজনা ফোড়ন কাটছে মাঝে মাঝে। কখনো বিদ্‌ঘুটে শব্দ করছে, যেন ধমকাচ্ছে, থামাতে চাইছে গান। জোহ্‌রা বেগম বিরক্ত হন। মনে মনে বলেন,—রেডিও জুড়ে এত জায়গা থাকতে এরকম গা ঘেঁষাঘেঁষির কি দরকার ? যা না তোরা, ঐ তো খালি পড়ে রয়েছে আরো কত কত মিটার।

ইংরেজি বাজনা এবার আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। বাঙলা গানের গলা টিপে ধরেছে যেন। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ থেকে কাটা-কাটা আওয়াজ বেরুচ্ছে। জোহ্‌রা বেগম চুল পরিমাণ ডান দিকে ঘোরান নির্দেশক কাঁটা। কিন্তু ঐ দিকে তখন আরবী খবর শুরু হয়ে গেছে। বাঙলা গান আর শোনা যায় না এখন।

বাঁ দিকে ইংরেজি। ডান দিকে আরবী। দু'দিকের দুটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্রের চাপে দম বন্ধ হয়ে মরে গেছে ঢাকা কেন্দ্রের বাঙলা গান। জোহ্‌রা বেগম বিরক্তির সাথে রেডিও সুইচ বন্ধ করেন। হাসানের দিকে চেয়ে বলেন,—না, আর হল না। এ রকম টুঁটি চেপে ধরলে কি আর বাঁচা যায়। নে, এবার তোর গল্পটা আবার শুরু কর, হাসান।

হাসার অসমাপ্ত গল্পটা আবার শুরু করে—

—ম্যানেজার সায়েব বিকেল বেলা অফিস থেকে ফিরে আসেন। একটা পরিচিত ক্ষুধা-উদ্রেককারী গন্ধ নাকে এসে লাগে তাঁর। তিনি রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে যান। বলেন, —কি গো মুরগী রান্না হচ্ছে, তা-ই না ? দেখলে, কি রকম নাক আমার ?

—হ্যাঁ, এই তো রান্না শেষ করলাম। তোমার অতিথি কখন আসবে ?

—আমার অতিথি! আকাশ থেকে পড়েন ম্যানেজার।—কিসের অতিথি ?

—কেন! কে নাকি আজ খাবে ? মুরগী কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর—

—মুরগি কিনে পাঠিয়েছি আমি ? না তো!

—হ্যাঁ, একটা লোক আজ দশ-এগারোটা সময় মুরগিটা দিয়ে যায় আর বলে যায়—তোমার অফিসের কোন বন্ধু নাকি আজ রাত্রে খাবে আমাদের বাসায়।

—নাঃ! আমি পাঠাইনি তো! ভুল করে কার বাসারটা আমাদের বাসায় দিয়ে গেছে।

—আরে, লোকটা যে রেডিওটা নিয়ে গেছে! বল্‌লে,—

—রেডিওটা নিয়ে গেছে!

—হ্যাঁ, বল্‌লে—

—এই রে সর্বনাশ করেছে! হায়-হায়-হায়! কি বলে নিল ?

—বললে, রেডিওটা নাকি সরান দরকার। তাই সাহেব ওটা নিয়ে যেতে বলেছেন।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন।

কিছুক্ষণ পরে ম্যানেজার সায়েব এজাহার দিতে থানায় চলে যান। তাঁর যাওয়ার বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে দুটো লোক বাসায় এসে বলে,—দারোগা সায়েব আমাদের পাঠিয়েছেন। চোর যে মুরগি দিয়ে গেছে সেটা থানায় নিয়ে যেতে হবে।

গিন্নী বলেন,—মুরগি তো রান্না হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ, রান্না করা মুরগি পাতিলসহ নিয়ে যেতে বলেছেন আপনাদের সায়েব। তিনি দারোগা সায়েবের ওখানে বসে আছেন। এগুলো নাকি মামলার আলামত হবে।

লোক দুটো পাতিলসহ মুরগির মাংস নিয়ে চলে যায়।

রাতে খেতে বসে ম্যানেজার বলেন,—রেডিওটা গেল। রেডিও আর হবে না কোনদিন। এবার দাও, বাটপাড়ের মুরগির রানে কামড় দিয়ে কিছুটা উসুল করি।

গিন্নী হাঁ করে তাকান স্বামীর দিকে।

—কি, এভাবে তাকাচ্ছ কেন ?

—মুরগির গোশ্‌ত থানায় নিয়ে গেল যে দু'জন লোক!

—থানায় নিয়ে গেল!

—হ্যাঁ। বললে, থানার দারোগা পাঠিয়েছেন। মামালার আলামত না কিসের জন্যে লাগবে। তুমিই নাকি পাতিলসহ নিয়ে যেতে বলেছ ?

—আমি বলেছি!

একেবারে থ বলে যান স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই।

—অদ্ভুত গল্প তো! বলেন জোহ্‌রা বেগম।—বাটপাড়ের এ গল্প কোত্থেকে যোগাড় করলি ?

—আজ আমাদের ব্যারাকের একজন বলেছিল গল্পটা। সত্যি কি বানানো, বলতে পারি না।

—সত্যিই হবে। তোর গল্প শুনে হুশিয়ার হওয়া গেল, যা হোক। আমার রেডিওটা ধরে টান দিলেই হয়েছিল আর কি! এই বনবাসে এটাই যে আমার সাথী।

রেডিওটা জোহ্‌রা বেগমের একমাত্র সাথী, সেটা জানে হাসানও। তাঁকে সাবধান করার উদ্দেশ্য নিয়েই সে গল্পটা বলেছে। গল্পটা তাদেরই স্কোয়াডের একজন বলেছিল আজ। শুনেই সে ছুটে এসেছে দেড় মাইল পথ।

—পৌনে সাতটা বেজে গেছে। খবরটা ধর তো, বাবা।

হাসান উঠে গিয়ে রেডিওটা সুইচ টিপে মিটার ঠিক করে।

বাঙলায় খবর হচ্ছে।

শুধু খবরের জন্যেই খবর শোনেন না জোহ্‌রা বেগম। খবর শুনতে বসে তাঁর মনে হয় কে যেন মাতৃভাষায় কথা বলছে।

সিন্ধু প্রদেশের ধুলিমলিন শহর হায়দারাবাদ। এ শহরে তিন বছর কেটে গেছে জোহ্‌রা বেগমের। শহরবাস করলেও বনবাসের মতই কাটছে তাঁর জীবন। বনবাস কথাটা তিনিই ব্যবহার করেন। তাঁর স্বামী মিষ্টার মেহবুব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। স্বামীর সাথে তাঁর দেখা হয় খুবই কম। ভোর ন'টায় যখন তাঁর ঘুম ভাঙে, তখন মেজাজ প্রায়ই দুরস্ত থাকে না। ছোট হাজরি খেয়ে অফিসে যান। দুপুরের খাওয়া অফিসে বসেই সারেন। তারপর অফিস থেকে সোজা ক্লাবে চলে যান। ক্লাব থেকে ফেরেন রাত দুপুরের পর। আর তাঁর সাথে দেখা হয়েও কোন লাভ নেই। মিস্টার মেহবুব ইংরেজিতে কথা বলতেই পছন্দ করেন। বাঙলা প্রায় বলেনই না। তাঁর বিশ্বাস, বাঙলায় কথা বলার বদভ্যাস না ছাড়লে ইংরেজিতে বাকপটুতা অর্জন সম্ভব নয়। এ বদঅভ্যাস যাদের আছে, তারা ইংরেজি বলে হোঁচট খেয়ে খেয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি হয়ে আসায় সুবিধে হয়েছে তাঁর। এখানে বাংলা বলবার দরকারই হয় না। বাইরে তো নয়ই, ঘরেও না। স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তার এক অংশ হয় ইংরেজিতে, আর এক অংশ বাঙলায়। ইংরেজি বলবার মত শিক্ষা অবশ্য জোহ্‌রা বেগমের আছে। কিন্তু ইচ্ছে করেই তিনি ইংরেজি বলেন না। বাঙলা ভাষার ওপর স্বামীর অবজ্ঞা তাঁকে ভালবাসতে শিখিয়েছে মাতৃভাষাকে।

জোহ্‌রা বেগমের একমাত্র সন্তান আনোয়ার। মেহবুব সাহেব ইংরেজি কায়দায় বলেন 'এনভার'। সে লন্ডনের এক ইস্কুলে পড়ে। মায়ের মাতৃভাষা-প্রীতি ছেলের মধ্যেও সংক্রামিত হতে পারে, এ ভয় তাঁর সব সময় ছিল। তাই কথা শেখার আগেই মায়ের স্নেহ-ক্রোড় থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছ'বছর বয়স পর্যন্ত ছিল গভর্নেসের কাছে। তারপর চার বছর কেটেছে মারীর এক ইস্কুলে। নানা ভাষার আবর্তের মধ্যে পড়ে ছেলে বাংলা ভাষার এক বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি করেছে। তারপর ছেলে দশে পা দিতেই নিজে গিয়ে রেখে এসেছেন লন্ডনের এক ইস্কুলে। সে আজ ছ'বছরের কথা।

জোহ্‌রা বেগমের একঘেঁয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটে রেডিও শুনে আর বাঙলা বই পড়ে। ঢাকা থেকে মাঝে মাঝে বাঙলা বই আনিয়ে নেন। বার বার পড়তে পড়তে সেগুলো প্রায়

মুখস্ত হয়ে যায়। যখন বই থাকে না, তখন রেডিওটাই হয় একমাত্র সাথী। এ সাথী একাই শুধু কথা বলে। এর সাথে কথা বলে মনের ভার হালকা করা যায় না।

আজ ছ'মাস হল হাসানকে পেয়েছেন। আরো সঠিকভাবে বলা যায়, আবিষ্কার করেছেন। একদিন দুপুর বেলা জানালার পাশে বসে জোহ্‌রা বেগম কলকাতা রেডিওর বাঙলা গান শুনছিলেন। বাইরের দিকে তাকাতেই দেখতে পান—একটি ছেলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। তার দিন কয়েক পরে আবার দেখলেন ছেলেটাকে। তারপরও একদিন। তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। চাকরকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন ছেলেটাকে। সে ভড়কেই গিয়েছিল। বাঙালী ছেলে। সামরিক বাহিনীর একজন সাধারণ সেপাই। জোহ্‌রা বেগম বুঝতে পারলেন—এই প্রবাসে ছেলেটি তাঁরই মত নিঃসঙ্গ, বাঙলায় কথা বলার জন্যে তারই মত পিপাসায় কাতর।

মাতৃ-হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহ এতদিন পরে প্রকাশের পথ পায়। আদর-যত্নে প্রথম দিনই ছেলেটিকে তিনি আপন করে নেন। দু'জনের প্রাণের নিরুদ্ধআবেগ এবার মাতৃভাষায় রূপ পায়।

হাসান তাকে 'মা' বলে ডাকে আজকাল। 'মা'—এই মধুর ডাকটির জন্য কতকাল উপোসী ছিল তাঁর মন। এখন মনে হয়—তাঁর নারী জন্ম একেবারে ব্যর্থ হয় নি।

হাসান মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে আসে। কখনো পুরোটা দিন, কখনো বিকেলটা কাটিয়ে 'নাইট রোল-কলের' আগেই ব্যারাকে ফিরে যায়।

রেডিও পাকিস্তান, করাচী। বাঙলায় খবর প্রচারিত হচ্ছে। একটু পরেই বাঙলা গান। যে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি বাঙলাভাষী, সে দেশের রাজধানীর বেতার কেন্দ্র থেকে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টায় তিন মিনিটের একটি মাত্র বাঙলা গান দেয়া হয়। এ গানটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে করাচী আর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবাসী অগণিত বাঙালি। এমন স্পষ্ট আওয়াজে বাঙলা গান শোনার সৌভাগ্য আর তাদের হয় না।

জোহ্‌রা বেগম সোফায় নড়েচড়ে বসেন।

সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিট। ইংরেজিতে ঘোষণা শোনা যায়,—'জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর তাঁর সাম্প্রতিক পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন।'

—এই হয়েছে! বাঙলা গান আজ আর হল না। জোহ্‌রা বেগমের কথায় হতাশা ফুটে ওঠে।

—কেন, মা ? হাসান বলে।

—বক্তৃতা হবে এখন। তুই কলকাতা ধর দেখি।

হাসান মিটারের কাঁটা কলকাতা কেন্দ্রের ওপর চড়ায়। সেখানে তখন হিন্দি গান চলছে।

—নে, বন্ধ কর রেডিও। রেগে বলেন জোহ্‌রা বেগম।—চল এবার খেতে যাই। তোর তো আবার ফিরে যাওয়ার সময় হল।

জোহ্‌রা বেগম শুতে যাবেন এমন সময় মেহবুব সায়েব আসেন।

—আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে ?

—হ্যাঁ, আজই 'কেব্‌ল্‌' পেলাম। ইংরেজিতে জবাব দেন মেহবুব সায়েব।—আনোয়ার আসছে। ওদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। করাচী এয়ারপোর্টে নামবে পরশু সন্ধ্যায়। ঐ দিন ভোরবেলা করাচী যাব।

—আমিও যাব।

—তুমি আর কি করতে যাবে এতদূরে ? এলেই তো দেখতে পাবে। আর তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কি ?

—তা ছাড়া ঐ ধরো আজকালকার 'এটিকেট'। কিছুই তো শিখলে না। শিখতে চেষ্টাও করলে না।

—ও শিখে কাজ নেই।

—হ্যাঁ, কাজ তো নেই-ই। ছেলে এসে যখন বলবে,—ম্যামি, হাউ ডু ইউ ডু ?—কি বলে উত্তর দেবে তখন ?

—কেন ? বলব, ভালো আছি। তুই কেমন আছিস ?

—তবেই হয়েছে আর কি! শোনো, তোমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়ে অসুবিধেয় ফেলতে চাইনে। আর—আর আমিও হাস্যাস্পদ হতে চাইনে। সেখানে আমার দু' একজন বন্ধুও থাকবেন। তাদের কাছে—

—থাক, থাক, তুমি একাই যাও। তোমাকে হাস্যাস্পদ করার ইচ্ছে আমার নেই।

জোহ্‌রা বেগম তাঁর শোবার ঘরে আরাম কেদারায় বসে একটা বাঙলা বই-এর পাতা ওল্‌টাচ্ছিলেন। বই-এর পাতায় কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছিলেন না তিনি। আনোয়ার এসেছে আজ দু'দিন। নিজের রক্তমাংস দিয়ে গড়া প্রাণপুত্তলী এখন বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার কথা-বার্তা চাল-চলনের কৃত্রিমতা মনকে পীড়া দেয়। কোথায় যেন কিসের অভাব—তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। তাঁর সন্দেহ জাগে, একেই কি তিনি পেটে ধরেছিলেন ?

—ম্যামি, মে আয় কাম ইন্‌ ?

—আয়। ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোস।

আনোয়ার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মায়ের সামনে বসে।

—ম্যামি, বোলো তো, ড্যাডি ইংলিশ ছিখেছিল কুধার থে ?

—কেন ?

—আজ এক বাত করার সুময় সোয়িং ম্যাশিনকে বুলছিলেন শিউইং মেশিন—অ লাফিং স্টক।

জোহ্‌রা বেগম বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকান ছেলের দিকে।

আনোয়ার আবার বলে,—জিস দিন ড্যাডি এয়ার পোর্টে যেয়েছিলেন, হামার ছাথে ছিল হামার এক ক্লাসমেট। যো করাচী আছ্‌লো। তার ড্যাডি ইরাক এমব্যাসির মিলিটারী

অ্যাট্যাশেই। হামি ইন্ট্রডিউস করিয়ে দিলম। ড্যাডি যা বুললেন! মী গ্যাড, কি প্রনানসিয়েশান! ছুনে হামার এমুন—এমুন—এমুন রাগ হুয়েছিল। অ্যাট্যাশেইকে বুলছিলেন 'এটাচী', কূ-দেইতাকে বুলছিলেন 'কোপ্-ডি-টাট', ডিভিজ্বনকে ডিভিশান। হায়দেরাবাদ ডিভিশান! হামার ফ্রেন্ড কি বুল্‌বে, বোলো তো। সোচ্‌বে, কুধারকার এক নেটিভ। এ নেটিভ অব—

—আনোয়ার! জোহ্‌রা বেগম ধম্‌কে ওঠেন।—বিলেত থেকে বাঁদর হয়ে এসেছিস!

অপ্রত্যাশিত ধমকে থতমত খেয়ে উঠে বেরিয়ে যায় আনোয়ার—

—মা ?

—কে হাসান ? আয় বোস।

হাসান ভেতরে এসে আনোয়ারের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ে।

জোহ্‌রা বেগম বলেন,—ঢাকা ধর দেখি, হাসান। কিছু একটা পাওয়া যেতেও পারে।

হাসান ঢাকা কেন্দ্র ধরে। সেখানে উর্দু গান হচ্ছে।

—চলতে দে। এর পরে বাংলা গান পাওয়া যেতে পারে। বলেন জোহ্‌রা বেগম।

উর্দু গান শেষ হওয়ার পর পর। পল্লীগীতি শুরু হয় :

এই না দ্যাশের মাটিতে যে
শ্যামল বিছান পাতা।
এই না দ্যাশের আস্‌মানে রে
আছে মেঘের ছাতা।

এই প্রবাসে পল্লীগীতিই সব চেয়ে ভালো লাগে জোহ্‌রা বেগমের। পল্লীর সুর যেভাবে নাড়া দেয়, এমন আর কোনটাই দেয় না।

গান চলছে। মোহাবিষ্ট হয়ে শুনছেন জোহ্‌রা বেগম। আবেশে তাঁর চোখ বুজে আসে। তাঁর মন গানের পাখায় ভর দিয়ে মানস বিহার করছে ছায়া-শ্যামল বাঙলায়। সেখানে নদী বয়ে চলেছে। উজান-ভাটি করছে কত শত নৌকো। ভাটিয়ালী সুরে গান গাইছে মাঝিরা। মাঠে কাজ করছে কৃষক। পল্লীবধূরা কলসী কাঁখে ঘরের পানে যাচ্ছে।

ঘটাং করে আওয়াজ হয় রেডিওতে। হঠাৎ জোহ্‌রা বেগমের আবেশ ভেঙে যায়। আনোয়ারের চোখে চোখ পড়তেই সে বলে,—ম্যামি, বি.বি.সি. ধরছি। ডান্স-এর বাজনা আছে এখুন। ইউ উইল লাইক ইট।

জোহ্‌রা বেগম কিছু বুঝবার আগেই 'রক্-এন্-রোল' বাজনা শুরু হয়ে গেছে আর আনোয়ার বাজনার আগেই নাচতে শুরু করেছে।

—হাসান, বন্ধ কর, বন্ধ কর রেডিও। চেঁচিয়ে ওঠেন জোহ্‌রা বেগম।

আনোয়ারের নাচ থেমে যায়। সে হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে মা-র থমথমে গম্ভীর মুখের দিকে। সে বুঝতে পারে না, কি অপরাধ সে করেছে।

পুরানা লালুক্ষেত, করাচী
৩রা চৈত্র, ১৩৬৪ মার্চ, ১৯৫৭

প্রতিষোধক

কিস্সার কথা বলতে বলতে নানী লক্ষ করেন—নাতনী অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তিনি বলেন,—কি রে আতিয়া, তুই কিছু শুনছিস না ?

—হ্যাঁ শুনছি, তুমি বলে যাও। চমক ভেঙে আতিয়া বেগম বলেন।

—হ্যাঁ, মন দিয়ে শোন। শুনলি তো ? ঐ মেয়েলোকগুলোও তোর মতই প্রশ্ন করেছিল।

নানী তাঁর কাহিনীর জের টেনে চলেন :

পরের দিন মেয়েলোকেগুলো তাঁর কাছে এল। তিনি বললেন,—তোমাদের সওয়ালের জওয়াব আমার মেয়ের কাছে পাবে। তারা তখন তাঁর মেয়ের কাছে গেল। তিনি তাদের বললেন,—তোমাদের সওয়াল কি ? কি জানতে চাও তোমরা ?

মেয়েলোকগুলো বলল,—আমরা জানতে চাই, একজন পুরুষ যদি চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, তবে একজন স্ত্রী কেন চারজন স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না ?

তিনি বললেন,—তোমাদের সওয়ালের জওয়াব দেব, কিন্তু তার আগে এক কাজ কর। চার রঙের চারটা বকরীর দুধ চারটা পাত্রে করে আমার কাছে নিয়ে এস।

তারা চলে গেল এবং দুধ নিয়ে ফিরে এল। তিনি তখন চারটা পাত্রে দুধ একটা পাত্রে মিশিয়ে বললেন,—কালো বকরীর দুধ কে এনেছ ? বেছে নিয়ে যাও। সাদা বকরীর দুধ কার বেছে নিয়ে যাও। সবাই বলল,—দুধ তো মিশে গেছে, এখন কেমন করে বেছে নেব ?

তিনি তাদের বললেন,—এখন বুঝতে পেরেছ তো, না, বুঝিয়ে বলতে হবে ?

মেয়েলোকগুলো তাদের সওয়ালের জওয়াব পেয়ে চলে গেল।

নানী তাঁর কাহিনী শেষ করে একটু দম নেন। আতিয়া বেগমের বিষণ্ন মুখে আরো মেঘ জমেছে। তাঁর দিকে চেয়ে নানী বলেন,—এবার তোর প্রশ্নের জওয়াব পেয়েছিস তো ? আর কি করে কি করবি, বোন ? আমরা মেয়েলোক মেয়েলোকই। পুরুষরা যেভাবে চালায়, সেভাবে চলতে হবে।

—না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমি তা সহ্য করতে পারবো না।

—সহ্য না করে উপায় কি বোন ? আমরা সহ্য করেছি আমার বিয়ের সময় আমার খেদমতের জন্যে আব্বাজান একজন বান্দী সাথে দিয়েছিলেন। বান্দীটাকে আবার তোর নানার সাথে বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন চিন্তা করে দ্যাখ, আমরা বাপের বাড়ি থেকেই সতীন সাথে করে স্বামীর ঘর করতে গেছি। তারপরেও তোর নানা দুইখান শাহি করেছিলেন।

—তোমাদের যুগ আর নেই। তোমাদের সময়ের মেয়েরা ছিল হাঁসী আর মুরগীর মত। কিন্তু আমরা তা নই। আমরা মানুষ। মানুষের মত বাঁচতে চাই। মানুষ হিসেবে পুরুষের সমান অধিকার চাই।

—অধিকার চাইলেই তো আর পাওয়া যাবে না। শরা-শরীয়ত তো মানতে হবে।

আতিয়া বেগম উঠে দাঁড়ান। বলেন,—নাহ্, তোমার সাথে তর্ক করে লাভ নেই। রাত অনেক হয়েছে। এবার শুয়ে পড়, আমি যাই।

আতিয়া বেগম শোবার ঘরে যান। দুই পাশে দুই খাটে ঘুমুচ্ছে শাহীন ও মমতা। আট বছরের ছেলে আর দু' বছরের মেয়ে।

শাহীনের একটা হাত লেপের বাইরে বেরিয়ে আছে। তিনি খাটের পাশে বসে তার হাতটা লেপের মধ্যে গুঁজে দেন। তারপর চেয়ে থাকেন ছেলের মুখের দিকে। একই ছাঁচে গড়া পিতা-পুত্রের মুখ। দশ বছর আগে আফতাবের মুখ অনেকটা এ রকমই ছিল। অন্তত: তাঁর চোখে সে মুখ তখন এমনি নিষ্পাপ, এমনি স্নিগ্ধ মনে হোত। অতীত দিনের স্মৃতি তাঁর মনের পর্দায় ছায়া ফেলতে শুরু করে :

লন্ডনে অধ্যয়নরত বাঙলাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আফতাব আহমদের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় ধাপ বেয়ে বেয়ে কেমন করে ভালবাসার মিনার-চূড়ায় আরোহণ করেছিল, তা ভাবতে আজও তাঁর মনে দোলা লাগে। আফতাব স্থপতিবিদ্যায় ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। ভালো মাইনের চাকরি নেন গিলবার্ট কনস্ট্রাকশান কোম্পানীতে।

আতিয়া বেগম এম. এড ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসেন তার পরের বছর। শিক্ষা বিভাগে তাঁরও ভালো চাকরি জুটে যায়।

দুই মন যখন এক ঠাঁই হয়ে আছে, তখন দুই হাত এক করতে আর অসুবিধে কি ? বেশ ধুমধামের সঙ্গেই আফতাব ও আতিয়া-র শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়ে যায়।

বিয়ের পরের সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা মনে পড়তেই আতিয়া বেগমের চোখের কোণে পানি চকচক করে। তিনি ভেবে পান না, সেদিনের সেই আফতাব কেমন করে আজকের এই আফতাবের মাঝে বিলিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাই। আজ তিনি বড় কন্ট্রাকটর। কোয়ালিটি কনস্ট্রাকশান কোম্পানীর মালিক। টাকা পয়সার হিসেব নেই। আর সেদিন তো ছিলেন আটশ' টাকা মাইনের কোম্পানীর আর্কিটেক্ট।

আতিয়া বেগম আঁচলে চোখ মোছেন। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে পড়ার ঘরে বসেন। পাশের তাক থেকে টেনে নেন একখানা বই। বইটা তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন আজ।

"রক্ত ও তার শ্রেণীবিভাগ" পরিচ্ছেদটার ওপর তিনি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখের জমাট মেঘ কেটে যায়। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বারবার পড়ে একটা বিশেষ অধ্যায়ের কতগুলো কথা তিনি মুখস্ত করে ফেলেন।

আতিয়া বেগম টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে শুরু করেন, কিন্তু দুটো সংখ্যা ডায়াল করেই কি ভেবে রিসিভারটা রেখে দেন। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন রাত

পৌনে এগারোটা। তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যান। ছোট্ট অস্টিনটা তাঁকে নিয়ে দ্রুত ছুটে চলে।

আতিয়া বেগম টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে শুরু করেন, কিন্তু দুটো সংখ্যা ডায়াল করেই কি ভেবে রিসিভারটা রেখে দেন। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন রাত পৌনে এগারোটা। তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যান। ছোট অস্টিন্‌টা তাঁকে নিয়ে দ্রুত ছুটে চলে।

গন্তব্যস্থল আর বেশি দূরে নয়। রাস্তার কিনারায় গাড়িটা রেখে আতিয়া বেগম হেঁটে চলেন, গেটের কাছে গিয়ে তাকান একবার বাড়িটার দিকে। ওপর তলার বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। আর কোন ঘরে আলো নেই। চাকর-বাকরেরা ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়।

গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই বিরাটকায় অ্যালসেশিয়ানটা পেছনের দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনের পা দুটো তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেয়। আতিয়া বেগম দু'হাত দিয়ে কুকুরটার দুই পা মর্দন করে চুপ করবার জন্যে আঙুলের ইশারা করেন। কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে আবার গেটের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘরে-পরার স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়েই তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাই সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়ও শব্দ হল না একটু।

অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যায়। এত রাত্রে কার সাথে কথা বলছেন ?

নিঃশব্দ পায়ে এগিয় যান আতিয়া বেগম। প্রথম জানালাটার কাছে যেতেই তিনি দেখতে পান—মিষ্টার আফতাব টেলিফোনে কথা বলছেন।

—শুনুন, রহমান সাহেব! যে রকম বোঝা যাচ্ছে, ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্সটা শিগগিরই পাস হয়ে যাবে। তাই আমি বলছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করে ফেলা দরকার।

আতিয়া বেগম দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—অ্যাঁ, আগামী মাসে ? না না, সে অনেক দেরি। এ মাসের মধ্যে হতে অসুবিধেটা কি ?.....তবে আর দেরি করে লাভ কি ? আপনি ব্যবস্থা করে ফেলুন। কোন জাঁকজমকের দরকার নাই।.....হ্যাঁ, আর একটা কথা, ঢাকার বাইরে হলেই ভালো হয়।.....কোথায় ? কুষ্টিয়ায় ? তা আমার দিক থেকে কোন অসুবিধে নেই.....। আচ্ছা, ওদের জিজ্ঞেস করে এসে আমায় বলুন। আমি ধরে আছি।

.....হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তা হলে পঁচিশ তারিখ.....কি বার পড়ে ?.....বুধবার ? হ্যাঁ, তা হলে এটাই ঠিক রইল। সব ব্যবস্থা করে ফেলুন। পনেরো দিন তো মাত্র বাকি।.....অ্যাঁ কোনটা ? 'বি' টাইপ কোয়াটার্স ? ওটার টেন্ডার খুলবে পরশু। আশা করি কন্ট্রাকটটা পেয়ে যাব। ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা হয়েছিল। সে তো আমার পুরনো তন্‌খাখোর।.....অ্যাঁ ? ও হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা আমি ভুলব না। আপনারা না ভুললেই হয়।.....হ্যাঁ তা টেন পারসেন্ট ? তা আপনি যদি ম্যানেজ করতে পারেন, আমার আপত্তি নেই।.....আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যালো রহমান সাহেব, সুরাইয়া ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ? .....একটু ডেকে দিন। অফিসের একটা দরকারী ব্যাপারে ওর সাথে কথা বলতে চাই।.....আচ্ছা আমি ধরে আছি।

—হ্যালো, কে সুরাইয়া ? সিভিল সাপ্লাইয়ের বিলটা চলে গেছে ?.....আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার দুলাভাই ওখানে নেই তো ?.....আচ্ছা শোন, তোমার দুলাভাই কিছু বলেছে ?.....কি আবার, পঁচিশ তারিখের কথা বলেনি ?.....থাক, আর নেকামো করো না।.....একা একা কি করছ ? চলে এসো না।.....হ্যাঁ, ডিক্টেশানই দেব।

.....শোন, একা একা ভালো লাগছে না। কথা বলার লোক নেই।.....ইন্সপেক্টেস ? সে তো নেই। তিন-চার দিন হল সে তার সরকারী বাসায় চলে গেছে।.....হ্যাঁ, তা ঝগড়া একটু হয়েছে বৈ কি। তুমি চলে এসো।.....অ্যাঁ, পঁচিশ তারিখের পর ? নাহ্, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। শোন সুরাইয়া, দিন তো আর বেশি নেই, মাত্র পনেরো দিন। গয়না-গাটির অর্ডার কালই দেয়া দরকার। আমার এখানে গয়নার ক্যাটালগ আছে দুটো। তুমি এসে যদি পছন্দ করে দিয়ে যেতে।.....না না, অফিসে এ সব চলে না। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।....অ্যাঁ ?.....না না, ওরা টের পাবে না। তোমার ঘর তো সিঁড়ির কাছেই। চোখ রেখো, সিগারেট জ্বললেই চুপি চুপি বেরিয়ে এসো।....আচ্ছা।

আফতাব রিসিভারটা রেখে দিয়ে দাঁড়ান। টেবিল থেকে গাড়ির চাবি হাতে নিয়ে দরজার দিকে এক পা বাড়িয়েই হঠাৎ চমকে ওঠেন।

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

আতিয়া বেগমের কণ্ঠে উষ্ণতার আভাস পেয়ে হকচকিয়ে যান আফতাব। আমতা আমতা করে বলেন,—না, একটু বাইরে যাচ্ছি।

—বাইরে কোথায় যাচ্ছ ?

—একটু শাহ্‌বাগ হোটেলে যাব। করাচী থেকে—

—থাক, মিছে কথা বলার চেষ্টা করো না।

—মিছে কথা!

—হ্যাঁ, মিছে কথা। তুমি কোথায় যাচ্ছ, জানি। সব শুনেছি।

এবার আরো থমমত খেয়ে যান আফতাব। পাশের টেবিলটার একটা কোণা ধরে তিনি মরিয়া হয়ে বলেন,—ও আড়ি পেতে শোনা হয়েছে ?

—হ্যাঁ, আড়ি পেতেই শুনেছি।

—তা বেশ করেছ। আমার যেখানে খুশি আমি সেখানে যাব। আফতাবের রাগ এবার গা মোড়ামুড়ি দেয়।

—যেখানে খুশি সেখানে যাবে ?

—নিশ্চয় যাব। আরো শুলে রাখ, এ মাসের পঁচিশ তারিখে আমাদের বিয়ে।

—হ্যাঁ, সবই তো শুনলাম।

—ব্যস, আর কি ? এবার যেতে পার।

—হ্যাঁ, যাব। তার আগে আমার কথার জবাব দাও।

—কি তোমার কথা ?

—আমি জানতে চাই, এ বয়সে কেন এ পাগলামি করতে যাচ্ছ ?

—পাগলামি! পাগলামির কি দেখলে তুমি ?

—পাগলামি নয় ? লোকে বলবে কি, বল তো ?

—কি বলবে আর। শুধু দুটো কেন, আমি চারটে বিয়ে করতে পারি। সে সামর্থ্য আমার আছে।

—হ্যাঁ, আর্থিক সামর্থ্য তো আছে। তারপর বল, দৈহিক সামর্থ্যও আছে!

—নিশ্চয়ই আছে।

—হ্যাঁ, তা তো আছেই!

উত্তেজনার মুখে কথাটা বলেই অস্বস্তি বোধ করেন আতিয়া বেগম। আর আফতাব তাঁর চোখের দিকে চেয়ে মিইয়ে যান।

আতিয়া বেগম বলেন,—বসো, কথা শোন।

অন্যমনস্কভাবে আফতাব একটা সোফায় বসে পড়েন। তাঁর সুমুখে আর একটায় বসেন আতিয়া বেগম । বলেন,—দ্যাখো, কেলেঙ্কারী করো না।

—কেলেঙ্কারী! আমি শরা-শরীয়ত মত বিয়ে করব, তাতে কেলেঙ্কারীর কি আছে ?

—হ্যাঁ, শরীয়তে পুরুষদের চারটে বিয়ে করবার বিধান দিয়েছে। কিন্তু যেসব কঠিন শর্তের উল্লেখ করেছে, তা পালন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

—নিশ্চয়ই সম্ভব।

—মোটেই নয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে সব স্ত্রীকে সমান চোখে দেখা কখনও সম্ভব নয়। কোরান শরীফে অসম্ভব শর্ত জুড়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

—দ্যাখো, নিজের খুশিমত কোরান শরীফের ব্যাখ্যা করতে যেও না।

—নিজের খুশিমত কিছুই বলছি না। ভালো করে পড়ে দেখো। তা ছাড়া, কোন্ সময়ে, কোন্ অবস্থায় এ বিধান দিয়েছে, জানো ?

—না, জেনে দরকার নেই।

—দরকার নিশ্চয়ই আছে। শোন, ওহোদের যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল মুসলমান মেয়েদের তুলনায় অনেক কম। ঐ সময়ে সুরা নিসা নাজেল হয়। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে আর ঐ বাড়তি মেয়েলোকদের গতি করবার জন্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা একজন পুরুষকে চারজন স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দেন। তাও আবার শর্ত সাপেক্ষে। কিন্তু এখন তো আর সে অবস্থা নেই। আমাদের দেশে পুরুষ আর মেয়েদের সংখ্যা প্রায় সমান। আর জন্মনিয়ন্ত্রণের যুগে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

—ও ইসলামের ঐ বিধানের আর দরকার নেই বলতে চাও ?

—তা কেন ? ইসলামের বিধান চিরদিন বেঁচে থাকবে। বিশেষ অবস্থার আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্যে তাকে কাজে লাগাবো।

—যেমন ?

—যেমন ধর, আমি যদি কোনদিন পঙ্গু হয়ে যাই, তখন তুমি আর একটা বিয়ে করতে পার। এখন শুধু ঐ কানুনের দোহাই দিয়ে আর একটা বিয়ে করে অশান্তিই ডেকে আনবে। কানুন তৈরি হয় সমস্যা সমাধানের জন্যে, সমস্যা বাড়াবার জন্যে নয়, মতলব হাসেলের জন্যে নয়।

—থাক, তোমার কথার কচ্‌কচি শুনতে চাইনে। আমার যা আমি ইচ্ছে তাই করব।

—তোমার যা ইচ্ছে তা-ই করবে ? তা বেশ! তা হলে আমিও যা ইচ্ছে তাই করব। আতিয়া বেগমের শরীর রাগে কাঁপতে থাকে।

—কি করবে ? কি তোমার ইচ্ছে ?

—আমিও আর একটা বিয়ে করব।

—আর একটা বিয়ে করবে! তা করো, শরীয়তে যদি সে রকম বিধান থাকে।

—শোন, একজন স্ত্রীলোকের চার স্বামী হলে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে গোলমাল বাঁধবে, কার সন্তান কোনটি চেনা যাবে না—এই যুক্তিতে চোদ্দশ' বছর আগে পুরুষদেরই শুধু চারটে বিয়ের অধিকার দেয়া হয়েছে, মেয়েদের দেয়া হয়নি। এ যুক্তির দোহাই দিয়ে এ যুগেও যদি পুরুষেরা চারটে বিয়ে করতে পারে, তবে ঠিক একই যুক্তিতে একজন স্ত্রীলোক একসঙ্গে দু'জন পর্যন্ত স্বামী গ্রহণ করতে পারে!

—সে কি রকম ?

—এটা বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগের একাধিক স্বামীর সন্তানদের চিনে বের করা মোটেই কষ্টকর নয়। সন্তানদের রক্ত পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, কে কার সন্তান।

—রক্তের শ্রেণীবিভাগের কথা জানি। কিন্তু তা দিয়ে সন্তান চেনা যাবে না।

—নিশ্চয়ই চেনা যাবে।

—যাবে! নিশ্চিতরূপে জানা যাবে কে কার সন্তান ?

—হ্যাঁ, নিশ্চিতরূপে, নির্ভুলভাবে জানা যাবে কে কার সন্তান।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস কর না ?

আতিয়া বেগম তাঁর হাতের বইটা খুলে নির্দিষ্ট একটা পৃষ্ঠা বের করে বলেন,—এখানে কি লিখেছে শোন—

Innumerable experiments and extensive work have definitely shown that unions of—

Parents O X O give only O, but cannot give A, B, AB
Parents O X A give only O, A but cannot give B, AB
Parents O X B give only O,B but cannot give A, AB
Parents O X AB give only A, AB but cannot give O, B

পড়া শেষ করে আতিয়া বেগম বলেন,—এবার বিশ্বাস হয়েছে তো ?

—হ্যাঁ, কিন্তু বিয়ে শাদীর ব্যাপারে এর প্রয়োগ অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব ? তোমার ও আমার রক্ত এক শ্রেণীর। ঐ বারে তোমার অপারেশান-এর সময় রক্তের দরকার হয়েছিল। আমি রক্ত দিয়েছিলাম। তখনই জানতে

পেরেছি, তোমার ও আমার রক্ত 'O' শ্রেণীর। আমাদের ছেলে-মেয়েদের রক্তও তাই। এখন আমি যদি আবার AB রক্ত শ্রেণীর একজনকে বিয়ে করি, তবে আমাদের সন্তান হবে A অথবা AB। সন্তান জন্মের পর রক্ত পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে—সে সন্তান তোমার না তার।

—দ্যাখো, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এ সব শুনতেও ঘেন্না লাগে

—ঘেন্না লাগে! শুধু শুনতেই ঘেন্না লাগে ? তুমি যে আর একটা মেয়েকে নিয়ে আমার চোখের সামনে ঘর করবে, তাতে আমার ঘেন্না লাগবে না ?

—দ্যাখো, পুরুষ আর মেয়েদের ব্যাপার আলাদা।

—মোটেও নয়। পুরুষ ও নারী একই রক্তে মাংসে গঠিত। তুমি যদি আর একটা বিয়ে কর, তবে আমিও করব।

—তা কর, কিন্তু কোন ধর্ম, কোন সমাজই তা বরদাস্ত করবে না।

—না করুক, তবুও, তবুও আমি দেখিয়ে দিতে চাই—

—হ্যাঁ, দেখাও। এ একটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত হবে। দুনিয়ার লোক তোমার প্রশংসায় হাততালি দেবে। পায়োনীয়ার বলে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে তোমার নাম। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন আফতাব।

—দ্যাখো, তোমার টিটকারির তোয়াক্কা করি না। ভালো চাও তো এ বিয়ে ভেঙে দাও।

—কেন ভেঙে দেব ? তোমার ভয়ে ? হুঁহ্—

—তোমার শাহীন আর মমতার কি হবে, ভেবে দেখেছ ?

—ভাববার কি আছে ?

—ভাববার কিছু নেই ? ওদের ভবিষ্যত ভেবেও তোমার সম্‌ঝে চলা উচিত।

—সম্‌ঝে চলা উচিত আমি কি কেরানী, না স্কুল মাষ্টার ? ওদের জন্যে এত টাকা রেখে যাব—

—দুনিয়াতে টাকাই সব নয়।

—নিশ্চয়ই, দুনিয়াতে টাকাই সব। ওদের জন্যে যা রেখে যাব, দু'হাতে খরচ করেও তা ফুরাতে পারবে না। তোমার ছেলেটা তো ইচ্ছে করলে চার চারটে বউ পুষতে পারবে।

—দ্যাখো, তোমার মাথায় ভূত চেপেছে। নিজে তো উচ্ছন্নে যাবেই, ওদেরকেও না নিয়ে ছাড়বে না।

—চুপ কর।

—কেন চুপ করব ? তুমি তোমার মত বদলাবে কি না, বল ?

—না।

—বিয়ে তা হলে করবেই ?

—হ্যাঁ, করব। নিশ্চয়ই করব এবং পঁচিশ তারিখেই তারিখ।

—বেশ, তা হলে আমিও বিয়ে করব।

—তা করো, কিন্তু বর জুটবে না।

—নিশ্চয়ই জুটবে। তুমি দেখে নিও।

—হ্যাঁ, দেখব।

—হ্যাঁ দেখবে, এই পঁচিশ তারিখের মধ্যেই দেখবে।

—আচ্ছা আচ্ছা, করে দেখিও।

আতিয়া বেগম উঠে দাঁড়ান। রাগে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে। ঘর থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

মিস্টার আফতাব ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন খোলা দরজার দিকে। কিছুক্ষণ পরে দাঁড়ান। তাঁর গম্ভীর মুখে ফুটে ওঠে অবজ্ঞার হাসি। নিজে নিজেই বলেন,—যত সব আজগুবি থিওরী। এ নিয়ে তর্ক করা সোজা । কাজে খাটানো অত সোজা নয়। গাড়ির হর্ণ শুনে তিনি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকান। পরিচিত একটা ছোট্ট গাড়ি বাঁদিকে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে গেল।

হঠাৎ তাঁর গাড়ি নিয়ে বেরুবার কথা খেয়াল হয়। তিনি হাতঘড়ির দিকে তাকান। বারোটা বেজে দশ মিনিট। তিনি মনে মনে বলেন,—শীতের রাত, এতক্ষণ কি আর সে জেগে আছে ? তবু একবার দেখতে দোষ কি ?

—হ্যাঁ, ঐ তো সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

মিস্টার আফতাবের মনটা নেচে ওঠে।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

মিস্টার রহমানের বাড়িতে টেলিফোন বাজছে। চার-পাঁচবার বাজবার পর আর ক্রিং শোনা যায় না। বোধ হয় রিসিভারটা তুলেছে কেউ।

সিঁড়ির নিচে এসে হঠাৎ থেমে গেছে সুরাইয়া। কান খাড়া করে কি যেন শুনছে।

এ কি! আবার দৌড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে কেন সে ?

মিষ্টার আফতাব অন্ধকারে দাঁড়িয় থাকেন। তাঁর বিস্ময়ের ঘোর না কাটতেই হঠাৎ দোতলার বারান্দায় বাতি জ্বলে ওঠে। মিসেস রহমান ত্রস্ত-ব্যস্তভাবে সুরাইয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছেন।

এবার তাঁর মনে বিদ্যুত খেলে যায়। সুরাইয়া হঠাৎ এ ভাবে ফিরে যাওয়া আর তার ঘরের দিকে মিসেস রহমানের যাওয়ার পেছনে টেলিফোনের ডাকটাই নিশ্চয় দায়ী। তিনি রাগে ঠোঁট কামড়ান। মনে মনে বলেন,—এ সব করেই কি আর আমাকে রুখতে পারবে ?

প্রাতরাশের পর সিগারেট ধরিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন মিস্টার আফতাব। রোজকার মত খবরের হেডিংগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বের করেন বিজ্ঞাপনের পাতা। টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তি খুঁজতে খুঁজতে একটা বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ পড়ে তাঁর। এ ধরনের বিজ্ঞাপন পড়তে এখনো পুলক জাগে তাঁর মনে। কিন্তু ওটা পড়েই তিনি চমকে উঠেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি আবার পড়েন বিজ্ঞাপনটা :

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

"উচ্চ শিক্ষিত, উদারচেতা এবং সংস্কারমুক্ত পাত্র চাই। পাত্রের রক্ত AB শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক। পাত্রী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, উচ্চ শিক্ষিতা এবং উপার্জনক্ষম। বিস্তারিত বিবরণসহ পত্রালাপ করুন। জি. পি.ও. বক্স নম্বর ৪২৩১"।

মিস্টার আফতাব কাগজ হাতে গুম হয়ে বসে থাকেন। ছাইদানীর ওপর তাঁর জ্বলন্ত সিগারেটটা পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বেয়ারার পায়ের শব্দে তাঁর চমক ভাঙে। ছাইদানীর ওপরে রাখা সিগারেটটার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি আর একটা সিগারেট ধরান। এঁটো পেয়ালা-পিরিচ ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে বেয়ারা চলে যায়। তিনি পাশ থেকে টেলিফোন তুলে নেন। ডায়াল করে ডাকেন,—হ্যালো, কে ? বক্স নম্বর ৪২৩১ ?.....হ্যাঁ দেখলাম।.....না, আশ্চর্য হই নি, বরং খুশি হলাম। আশা করি বিজ্ঞাপনদাতার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।.....আমার ইচ্ছে ? আমারটা তো পূর্ণ হবেই।.....পাত্রীর বিশেষণগুলো পড়ে কিন্তু আমারই আবার পাত্র সাজবার লোভ হচ্ছে।.....হ্যাঁ,—হ্যাঁ, তা ঠিকই। কিন্তু আসল বিশেষণগুলো বাদ পড়ল কেন ? .....কোন্‌গুলো ? যারটা তারই তো জানা উচিত। আমায় বলতে হবে কেন ? .....অ্যাঁ, আমার মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগবে ? আচ্ছা বলছি, কালকের বিজ্ঞাপনে তা জুড়ে দেয়া হবে তো ?.....ও পছন্দ হলে। আচ্ছা বলছি—পাত্রী বিবাহিতা এবং দুই সন্তানের জননী। কেমন পছন্দ হল তো ?.....না ? অ্যাঁ ? লেখা হবে না ?.....কেন ?.....ও পরে প্রার্থীদের জানানো হবে ? তা বেশ। কিন্তু তখন জেনেশুনে বাসি ফুলের ওপর কি আর মৌমাছি বসবে ? উঁহুঁ! যদি বসে তো বস্‌বে বোলতা, না হয় গুবরে মাছি—হ্যালো—হ্যালো।

তিনি আবার ডায়াল করে থাকেন,—হ্যালো, একি! ছেড়ে দেয়া হল কেন ? .....নোংরা! নোংরা কথা বললাম কখন ?.....ওগো সত্য কথাই তো বলেছি। বাসি ফুলের ওপর গুবরে মাছি বসবে না তো কি মৌ-মাছি বস্‌বে ? হ্যালো—আহ্, আবার ছেড়ে দিয়েছে!

রিসিভারটা নামিয়ে রাখেন মিস্টার আফতাব। সোফায় হেলান দিয়ে বসেন আরাম করে। তাঁর মুখ থেকে এমন মোক্ষম, এমন লাগসই একটা উপমা বের হওয়ার জন্যে তিনি খুশি হন খুব। তাঁর মনের ভার অনেকটা হালকা হয়।

তারপর সপ্তাহখানেক চলে যায়।

দিনগুলো যে তাঁর নির্ভাবনায় কেটেছে, তা নয়। বিজ্ঞাপনের ফল জানবার জন্যে মাঝে মাঝেই তাঁর মনে কৌতূহল জেগেছে। কিন্তু জোর করে তিনি তা দমন করেছেন। শেষে এক দিন কৌতূহলের সাথে যোগ হয় টিটকারি দেয়ার লোভ। তিনি টেলিফোনে আতিয়া বেগমকে ডাকেন। কিন্তু খবর শুনে চমকে ওঠেন। তাঁর টিটকারি দেয়ার লোভ উবে যায়। ভাবনার ঢলে ডুবে যায় তাঁর মন :

দুনিয়ায় এমন ক্যাবলাও আছে তা হলে ? সব জেনে-শুনে রাজী হয়ে গেল! বোধ হয় তাকে কিছুই ভেঙে বলা হয়নি। ঠগবাজী করে বড়শিতে গাঁথা হচ্ছে। কিন্তু বয়সটাও কি বিবেচনা করে দেখেনি আহাম্মকটা ? পঁচিশ বছরের নওজোয়ান! কি জানি, বোধহয়

ব্রাউনিং রোমান্সের শখ। লোকটা নাকি আবার চিত্রশিল্পী, প্যারী ঘুরে এসেছে। গগাঁ-লোত্রেকদের সমগোত্রীয় এ সব হতচ্ছাড়াদের তো আবার চরিত্রের বালাই নেই।

তাঁর মাথার মধ্যে ব্যাপারটা এলোমেলো ভাবে ঘুরপাক খায়। তিনি নানা দিক থেকে এটাকে যাচাই করবার চেষ্টা করেন। শেষে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কেন একটা আজগুবি আর অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে তিনি শুধু শুধুই মাথা ঘামাচ্ছেন ? এমন হাস্যকর ব্যাপারকে একটা গুরুত্ব দেয়ার কোন অর্থ হয় না। তিনি বুঝতে পারেন—এ শুধুই একটা চালবাজি। ধাপ্পা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করার মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। অনর্থক এ ভাবে বিচলিত হওয়ার জন্যে নিজের কাছেই লজ্জিত হন তিনি।

চিন্তাটাকে মন থেকে জোর করে ঝেড়ে ফেলেন মিস্টার আফতাব। সুরাইয়াসহ মিস্টার রহমান সপরিবারের কুষ্টিয়া চলে গেছেন দু'দিন আগে। শুভ দিন এগিয়ে আসছে। আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। আনন্দের তারাগুলো একে একে জ্বলতে শুরু করেছে তাঁর মনের আকাশে। সেখানে কোন মেঘই তিনি এ সময়ে জমতে দেবেন না।

তবুও মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন মেঘ এসে জমা হয়! তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্যেই। তাঁর অবিশ্বাসের ঝড়ো হাওয়া সেগুলোকে তাড়িয়ে দেয়।

বিকেল তিনটের স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ থেকে রওনা হবেন মিস্টার আফতাব। গোয়ালন্দ হয়ে যাবেন কুষ্টিয়া। দুপুরের আগেই তাঁর বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে কয়েকটা জিনিস। নতুন আর দামী এ জিনিসগুলোয় চাকর-বাকরের হাতের ছোঁয়া লাগবে, তা পছন্দ নয় তাঁর। তাই মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি নিজেই জিনিসগুলো গোছগাছ করতে লেগে গেছেন। ফর্দের সাথে মিলিয়ে একটার পর একটা গয়নার বাক্স আর শাড়ি-ব্লাউজের প্যাকেট তুলছেন একটা সুদৃশ্য চামড়ার বাক্সে।

দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছে।

তিনি পেছন ফিরে তাকান।

আতিয়া বেগমের চাপরাশী। সালাম দিয়ে সে ঘরে ঢোকে। একটা লেফাফা তাঁর হাতে দিয়ে সে চলে যায়।

লেফাফাটা খুলে তিনি চিঠিটা পড়েন—

গ্রীণ এরো, ঢাকা স্টেশন,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬১

প্রিয় আফতাব,

দাম্পত্য জীবনে তুমি বা আমি কেউ আর এখন একনিষ্ঠ বলে দাবী করতে পারি না। আমাদের দুজনেরই ভালবাসা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেছে। সম্বোধনে আগের মত 'প্রিয়তম' লিখে কপটতা করার ইচ্ছে তাই নেই।

আজ সোয়া একটার ট্রেনে চাটগাঁ যাচ্ছি। ট্রেনে বসেই লিখছি এ চিঠি। কেন যাচ্ছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তোমার দেখাদেখি আমিও পঁচিশ তারিখই ধার্য করেছি। ইতি—

আতিয়া

মিস্টার আফতাব ঘড়ি দেখেন। পৌনে দুটো। ট্রেন বহু আগেই ছেড়ে গেছে।

তাঁর সারা মুখে কালো ছায়া। শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠা-নামা করে কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। তিনি আচ্ছন্নের মত বসে থাকেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নেন তিনি। তিনি মনে মনে বলেন,—এ আর এক নম্বর ধাপ্পাবাজি। মনে করেছে, ধাপ্পা দিয়েই সব বানচাল করে দেবে। ওঁহু, ও সবে এ বান্দা টলে না। পা যখন বাড়িয়েছি, তখন কার সাধ্য পথ আটকায়।

একটু চিন্তা করে অস্ফুট স্বরে বলেন আবার,—আমার সাথে আড়ি দিয়ে দিন ধার্য করা হয়েছে। আমি যাচ্ছি কুষ্টিয়া আর উনি যাচ্ছেন চাটগাঁ। চমৎকার চাল। এখনি বাসায় টেলিফোন করলে সব ফাঁস হয়ে যাবে।

মিস্টার আফতাব উঠে গিয়ে টেলিফোন করেন,—হ্যালো, কে ?.....গভার্নেস ? বেগমকে ডেকে দিন।.....অ্যাঁ, নেই ? কোথায় গেছেন ?.....চাটগাঁ!

রিসিভার রেখে দিয়ে তিনি আবার ভাবেন—চাটগাঁ যেতে হলে নিশ্চয়ই ছুটি নিতে হয়েছে। অফিসে খোঁজ নিলে বেরিয়ে পড়বে কেমন চাটগাঁ যাওয়া হয়েছে।

তিনি তখনি টেলিফোন করেন আতিয়া বেগমের অফিসে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় ইন্সপেকট্রস দু'সপ্তাহের ছুটি নিয়েছেন।

এবার তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকেন ঘরের এদিক-ওদিক।

ড্রাইভার এসে স্মরণ করিয়ে দেয়,—হুজুর, সোয়া দুইটা বাজে। মালপত্র গাড়িতে তুলব ?

মিস্টার আফতাব শূন্য দৃষ্টিতে ড্রাইভারের দিকে তাকান। অন্যমনস্কভাবে বলেন,—অ্যাঁ, কি বল্‌লে ?

—সময় হয়ে গেছে, হুজুর।

—সময় হয়ে গেছে! আচ্ছা, যাচ্ছি।

—মালপত্র গাড়িতে তুলব ?

—একটু পরে।

ড্রাইভার চলে যায়।

মিস্টার আফতাব রিসিভার তোলেন। নম্বর ডায়াল করে ডাকেন,—হ্যালো, পি. আই. এ. রিজার্ভেশন ?.....গুড্ আফটারনুন। দেখুন, আজ সন্ধ্যের ফ্লাইটে চিটাগাং-এর একটা সীট দরকার।.....আচ্ছা, খোঁজ করে বলুন।.....অ্যাঁ, আছে ? ধন্যবাদ। নাম লিখে নিন, এ. আহমদ। আমি এখনি টিকেট কিনতে লোক পাঠাচ্ছি।

মিস্টার আফতাব চাটগাঁ যেতে পারেন—এরকম সন্দেহ আতিয়া বেগমের মনেও জেগেছিল। তিনি অনুমান করেছিলেন কুষ্টিয়া যাওয়া বাতিল করে আফতাব হয়তো তাঁর পিছু ধাওয়া করবেন, চাটগাঁ গিয়ে হৈ-হট্টগোল করতে চাইবেন। তাই রওনা হবার সময় শাহীন-মমতার গভার্নেস-এর কাছে তিনি চাটগাঁর একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ মত চাটগাঁর প্লেন ছাড়বার সময় পার করে গভার্নেস

টেলিফোন করেন আফতাবের বাড়িতে। খবরটা যোগাড় করে তক্ষুণি চাটগাঁর নম্বরে ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দেন—মিষ্টার আফতাব সন্ধ্যার প্লেনে চাটগাঁ রওনা হয়ে গেছেন।

হোটেল রয়েল-এর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষ। আরাম-কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে নির্জীবের মত পড়ে আছেন মিস্টার আফতাব। প্লেনে বসে প্রতিকারের যে সমস্ত উপায়গুলো তিনি সারাক্ষণ ভাবতে ভাবতে এসেছিলেন, সেগুলোরই রোমন্থন চলে তাঁর মনের মধ্যে। কিন্তু উপায়গুলোর একটাও তাঁর মনঃপূত হয় না। ওর যে কোনটার আশ্রয় নিতে গেলেই হৈচৈ হবে, মান-ইজ্জত বিপন্ন হবে। মাঝে মাঝে তিনি আঁকড়ে ধরেন তাঁর সেই অবিশ্বাসের খুঁটি। মনে মনে বলেন,—ও সবের কোনই দরকার হবে না। গোপনে পিছু নিলেই সব চালবাজি বেরিয়ে পড়বে।

তিনি ঘড়ির দিকে তাকান। রাত ন'টা। ট্রেন আসার আর আধ ঘন্টা মাত্র দেরি। তিনি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যান রেল-স্টেশনে।

অস্থিরভাবে তিনি প্ল্যাটফর্মের এ-মাথা ও-মাথা করেন বার কয়েক। হঠাৎ ঘন্টির আওয়াজ শোনা যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলো প্রায় তার বরাবরই এসে থেমেছে। তিনি মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকে সরে যান। ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে দূর থেকে চেয়ে থাকেন কামরাগুলোর দিকে।

দরজায় আতিয়া বেগমের মুখ দেখা যায়। কে একজন ফেল্ট-হ্যাটধারী এগিয়ে যাচ্ছে কামরার দিকে। আতিয়া বেগম হেসে আর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

মিস্টার আফতাবের বুকে ভেতর ধক্ করে ওঠে।

বাক্স-বিছানা মাথায় নিয়ে কুলি আগে আগে চলছে। তার পেছনে আতিয়া বেগম আর সেই লোকটি। তাঁরা পাশাপাশি কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন। আতিয়া বেগমের চেয়ে দু'তিন ইঞ্চি লম্বাই হবে লোকটি। তবুও পুরুষ হিসেবে তাকে একটু বেঁটেই মনে হয়।

মিস্টার আফতার নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাঁদের অনুসরণ করতে থাকেন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের দিকে হাতের ইশারা করে লোকটি। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। বাক্স-বিছানা ক্যারিয়ারে তোলা হলে লোকটি গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

এতক্ষণে লোকটার মুখ দেখবার সুযোগ পান মিষ্টার আফতাব। উজ্জ্বল ফরসা রঙ, টিকলো নাক, মাধুর্যমণ্ডিত মুখ। বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি হবে না।

লোকটির সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে তাঁর নিজের চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে।

আতিয়া বেগম গাড়িতে ওঠে বসেন। লোকটি তাঁর পাশে বসে দরজা বন্ধ করে দেয়। ট্যাক্সি রওনা হয়।

মিস্টার আফতাব তাড়াতাড়ি আর একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়েন। আগের ট্যাক্সিটার পিছু পিছু যাওয়ার নির্দেশ দেন ড্রাইভারকে।

অনেকটা পথ চলে, অনেক মোড়ে ঘুরে ট্যাক্সিটা কসমোপলিটান হোটেলের দরজায় গিয়ে থামে। কারো বাড়িতে যাচ্ছে না সে!

যে আশার আলো নিভু নিভু করেও তাঁর মনে এতক্ষণ জ্বলছিল, তা এবার দপ করে নিভে যায়। তিনি অনুমান করেছিলেন—আতিয়া বেগম মনের দুঃখে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। সাথের যুবকটি সেই বাড়িরই কেউ।

মিস্টার আফতাব তাঁর ট্যাক্সিটা থামিয়ে রাস্তার পাশে নেমে পড়েন।

ট্যাক্সি থেকে নেমে যুবকটির সাথে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান আতিয়া বেগম। তাঁদের অনুসরণ করে তে-তলা পর্যন্ত আফতাব। কিন্তু তাঁদের আর দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর কোন কামরায় ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়।

সামনে এগিয়ে যাবেন, না নেমে যাবেন স্থির করবার আগেই দেখেন বাক্স-বিছানা নিয়ে দু'জন বেয়ারা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। তিনি কয়েক পা এগিয়ে বারান্দার রেলিংয়ে হাত রেখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন। বেয়ারা দু'জন তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কিছু দূর গিয়ে তারা একটা কামরায় ঢুকতেই তিনি সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যান কামরাটার নম্বর যোগাড় করেই নেমে যান নিচে।

আতিয়া বেগম যে রুমে উঠেছেন, তার উল্টো দিকে একটা রুম পেয়ে যান মিস্টার আফতাব। কামরায় ঢুকেই একটা চেয়ার টেনে জানালার পাশে বসেন। পর্দা ফাঁক করে চেয়ে থাকেন সুমুখের দরজার দিকে।

দু'জনের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু যুবকটির বেরুবার নামগন্ধ নেই। সে কি ওখানেই রাত কাটাবে নাকি!

মিস্টার আফতাবের মনের চিন্তাগুলো বিছার মত কিলবিল শুরু করে দেয়। ক্রোধে তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। তিনি অস্থিরভাবে চুল টানতে থাকেন।

একবার তাঁর মনে হয়—আর সময় দেয়া ঠিক নয়। সর্বনাশ ঘটবার আগেই চড়াও হওয়া দরকার।

পকেট থেকে পিস্তল হাতে নিয়ে তিনি দরজা পর্যন্ত এগোন। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে আসেন। হৈ-হট্টগোল করবার তাঁর মোটেই ইচ্ছে নেই।

রাত বেড়ে চলেছে। মিস্টার আফতাব পর্দা ফাঁক করে একভাবে চেয়ে আছেন।

কিন্তু লোকটা বেরুচ্ছে না কেন? ওখানেই শুয়ে পড়ল নাকি?

এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। পিস্তলটা মুঠোয় ধরে তিনি কামরা থেকে বার হন। কিন্তু ঐ রুমের দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ান। কথাবার্তার ক্ষীণ আওয়াজ পাওয়া যায়। তিনি আবার নিজের কামরায় ফিরে আসেন। চেয়ারটায় বসে দাঁতে দাঁতে ঘষতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে লোকটি বেরিয়ে আসে। মিস্টার আফতাব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

কিন্তু লোকটা যে ঐ রুমটার ঠিক পাশেরটায় ঢুকল!

আর এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক নয়। লোকটা হয় তো এখনি গিয়ে ঢুকবে আবার।

মিস্টার আফতাব দ্রুত-পায়ে ঘর থেকে বের হন। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েন আতিয়া বেগমের রুমে।

আতিয়া বেগম শোবার আয়োজন করছিলেন। হঠাৎ তাঁকে দেখে চমকে ওঠেন। ভয়ে পিছিয়ে যান দু'কদম।

মিস্টার আফতাবের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তিনি রাগে কাঁপছেন।

কিছুক্ষণ কারো মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না। মিস্টার আফতাবই প্রথমে কথা বলেন,—এসব কি হচ্ছে ? বজ্র-গম্ভীর তাঁর স্বর।

—কোথায় কি হচ্ছে ?

—কোথায় কি হচ্ছে! আমি কিছুই দেখি নি মনে করেছ ?

—দেখেছ বেশ করেছ! কিন্তু চিল্লাচ্ছ কেন ? লোক জড় করবার ইচ্ছে আছে ?

আতিয়া বেগম এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেন। ফিরে এসে বলেন,—কি বলতে চাও, ধীরে-সুস্থে বল। দয়া করে চিল্লাচিল্লি করো না।

—তোমার ঘরে কে ছিল এতক্ষণ ?

—কে ছিল, বুঝতে পারছ না ? চল আলাপ করিয়ে দিই।

—দ্যাখো, তুমি যেমন, পড়েছও তেমনি এক বদমায়েশ পাল্লায়।

—চুপ কর। যা-তা বলো না।

—কেন বলব না ? তোমরা যা করতে যাচ্ছ, কোন ধর্ম, কোন সমাজ তা বরদাস্ত করবে না।

—কেন করবে না ? পুরুষদের স্বেচ্ছাচার যদি বরদাস্ত করতে পারে, তবে মেয়েদেরটা করতে পারবে না কেন ?

—দ্যাখো, আর কোন তর্ক করতে চাইনে।

—তর্ক করতে তোমাকে কে ডেকেছে ? কেন এসেছ এখানে ?

—এসেছি তোমকে ফিরিয়ে নিতে।

—ফিরিয়ে নিতে! কেন ?

—কেন আবার কি ? স্বামী হিসাবে আমার দায়িত্ব রয়েছে।

—তোমার আবার দায়িত্বজ্ঞান আছে নাকি ?

—চুপ। আর কোন কথা শুনব না। চল, ফিরে চল।

—না, আমি যাব না।

—বাজে কথা রাখ। এখন ফিরে চল।

—ফিরে যাওয়া এখন সম্ভব নয়।

—কেন নয় ?

—কেন নয়, তা বুঝেতেই পারছ। সব ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেছে, এখন—

—দ্যাখো, যদি ফিরে না যাও, তোমাকে আমি—'বাইগ্যামির চার্জে' ফেলব।

—হ্যাঁ যাও। কোর্টে গিয়ে মামলা কর।

—অগত্যা তাই করতে হবে। কিন্তু তার পরিণাম ভেবে দেখেছ ?

—পরিণাম না ভেবেই কি এ পথে পা দিয়েছি, ভেবেছ ? কি হবে ? কয়েক বছর জেল, এই তো ? হোক। স্বামীর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে স্ত্রীর এ সংগ্রাম একেবারেই বিফলে যাবে না। নারী জাতির সামনে এ এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পুরুষদের বহুবিবাহের

বিরুদ্ধে আমার যুক্তি একদিন না একদিন আইনের মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই ?

—ও সব বড় বড় বুলি রাখ। এবার ফিরে চল।

—না আমি যাব না।

—যাবে না ?

—না।

—তোমাকে যেতেই হবে।

—না গেলে ?

—না গেলে পুলিশ ডাকব।

—তা ডাক। কিন্তু জেনে রাখ, এ ব্যাপারে পুলিশের করবার কিছু নেই।

—তা হলে আমি এক সাংঘাতিক কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য হব।

—কি সাংঘাতিক কথা ?

—তোমাকে আমি তালাক দেব।

—দাও। তা হলে তো বেঁচে যাই। হাত-পা ধুয়ে পাক-সাফ হই।

—দ্যাখো, আর বাড়াবাড়ি করো না। এবার ফিরে চল।

—আহা, হাত ছাড়। বিরক্ত করছ কেন ?

আতিয়া বেগমের রাগ রক্তিম চোখ-মুখের দিকে চেয়ে তিনি ভড়কে যান। হাত ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়েন।

আতিয়া বেগম বাথরুমে যান। ফিরে এসে খোপার ক্লিপ-কাঁটা খুলে রাখেন টেবিলের ওপর। ভাঁজকরা লেপটা বিছানার ওপর পেতে দেন। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বলেন,—রাত সাড়ে বারোটা। এবার উঠতে পার। আমি ঘুমোব।

মিস্টার আফতাব গুম হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠেন। ধরা গলায় বলেন,—আতিয়া, আমার মত বদলেছি। তুমি ফিরে চল।

—কিসের মত বদলেছ ?

—আমি আর বিয়ে করব না।

—বিয়ে করবে না! কিন্তু এখন একথা শুনিয়ে লাভ কি ? আমি তো আর আমার মত বদলাতে পারব না।

—নিশ্চয় পারবে।

—না, পারব না। আমি নিরুপায়।

মিস্টার আফতাব উঠে যান। আতিয়া বেগমের কাছে গিয়ে বলেন,—আতিয়া, আমার মাপ কর। আমি আর কোন দিন বিয়ের কথা মুখে আনব না।

—হ্যাঁ, দশ বছর আগে এরকম কথাই শুনতাম। পুরুষদের আমি বিশ্বাস করি না।

—এবার বিশ্বাস কর। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আর কোন দিন ওকথা মুখে আনব না।

আতিয়া বেগম খাটের কিনারায় বসে পড়েন। তাঁর মুখ থমথম করছে। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আফতাব বলেন,—কি ভাবছ এত ? দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল।

—কিন্তু ভদ্রলোকটির সাথে আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ওঁকে ধোঁকা দিতে পারব না।

—এতে ধোঁকা দেয়ার কি আছে ?

—নিশ্চয়ই আছে। ওঁকে আমিই টেনে এনেছি এ পথে। বেচারাকে এভাবে দাগা দিয়ে ভেগে যাব, তা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—তবে কি করতে চাও ?

—ও-র কাছে আমাদের মাপ চাওয়া উচিত।

—মাপ চাইতে হবে কেন আবার ?

—মাপ চাইতে হবে না ? বেচারাকে—

—আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার যা অভিরুচি। কিন্তু আমাকে মাপ চাইতে হবে কেন ?

—নিশ্চয় চাইতে হবে। সব কিছুর জন্যে তুমিই তো দায়ী।

—আচ্ছা ঠিক আছে।

আতিয়া বেগম হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। মিস্টার আফতাব আবার বলেন,—তবে আর দেরি করছ কেন ? চল মাপ চেয়ে আসা যাক।

—চল। হ্যাঁ, আর একটা কথা। তুমি যে মত বদলেছ, কুষ্টিয়ায় টেলিগ্রাম করে দাও।

—এত রাত্রে কোথায় যাব টেলিগ্রাম করতে ? কাল করলেই চলবে।

—না। চল, হোটেলের টেলিফোন থেকে ফনোগ্রাম করে দিয়ে আসি।

রুম থেকে বেরিয়ে দু'জনেই নিচে চলে যান। ফনোগ্রাম পাঠিয়ে কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে আসেন।

নিজের রুমে না গিয়ে পাশের রুমের দরজায় খটখট আওয়াজ দেন আতিয়া বেগম। তাঁর পেছনে মিস্টার আফতাব।

কয়েকবার খটখট দেওয়ার পর বাতি জ্বলে ওঠে। ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়—'খুট' করে।

আতিয়া বেগম দরজাটা একটু ফাঁক করে মুখ বাড়াতেই মিষ্টার আফতাব শুনতে পান—রুমরে ভেতরে কে যেন স্যানডেল পায়ে দৌড়াচ্ছে।

তাঁরা দু'জনেই ভেতরে ঢোকেন। মিস্টার আফতাব কাউকে না দেখে আশ্চর্য হন।—লোকটা ভয়ে পালিয়ে গেল নাকি!

হঠাৎ খাটের ওপর নজর পড়তেই দেখেন—কে একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে রয়েছে। আর খাটের পাশ থেকে ঝুলছে কালো সাপের মত একটা জিনিস।

কি ওটা!

মিস্টার আফতাবের দুই চোখে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ চমকায়। তিনি বেণীটার দিকে চেয়ে বোকার মত হাসতে থাকেন।

৩৮/৫-ই জাহাঙ্গীর রোড (পূর্ব) করাচী

৩ পৌষ, ১৩৬৯ ডিসেম্বর, ১৯৬২

বনমানুষ

নতুন চাকরি পেয়ে কলকাতা এসেছি। সম্পূর্ণ অস্থায়ী চাকরি। যে কোন সময়ে, বিনা কারণে ও বিনা নোটিশে বরখাচ হওয়ার সম্ভাবনা। নিয়োগ-পত্রে এসব শর্ত দেখেও ঘাবড়াইনি একটুও। বন-বিভাগে চাকরি করতাম ষাট টাকায়। এখানে পাব একশ' তিরিশ টাকা। ডবলেরও বেশি। এমন সুবর্ণ সুযোগ কোন নির্বোধ পায়ে ঠেলে দেয় বলে আমার মনে হয় না। আর যা-ই হোক, আমি দু'পায়ে হাঁটি। জঙ্গলে যারা চার পায়ে হাঁটে, তাদের প্রতিবেশে থেকে আমার বুদ্ধিটা লোপ পেয়ে যায়নি। সত্তর টাকা বেশি পাব–এ কি যেমন-তেমন ব্যাপার! বিয়ে করেছি অল্প দিন। এখন ডবল টাকারই দরকার। তা ছাড়া জঙ্গল ছেড়ে এসেছি শহরে, হিংস্রালয় ছেড়ে লোকালয়ে, আঁধার ছেড়ে আলোকে। এরকম সভ্য সমাজে আসাটাও একটা মস্ত লাভ।

চাকরিতে যোগ দিয়েছি গতকাল। আজ দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার। ন'টা না বাজতেই খেয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। মেসের খাওয়া। কি খেলাম বলব না। বলতে লজ্জা করে। তা ছাড়া খাওয়াটা গৌণকর্ম, নেহায়েতই রান্নাঘরের ব্যাপার। যা মুখ্য তা হচ্ছে আমাদের পোশাক। সাজ-পোশাকই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি। কোন রকমে শাকভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেও এ দেহকে দুরস্ত খোলসে ঢেকে ভদ্রলোক সাজাতেই হবে। তাছাড়া উপায় নেই ভদ্র সমাজে বের হওয়ার। আমাদের মত খুদে অফিসারদের ব্যাপার আরো জটিল। কোট-প্যান্ট পরে, টাই বেঁধে দুরস্ত হওয়া চাই, নয় তো ওপরওয়ালা সায়েবদের সুনজর হবে না কোনদিন। তাঁদের কথা, ঘোড়ায় চড়ে না হোক, গাধায় চড়েও কেন আমরা তাদের অনুসরণ করব না ? অফিসে তাই অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগের হয়ে দাঁড়ায়।

মেসের এক সদস্যের সাহায্য নিয়ে গলগ্রন্থিটা কোনরকমে বেঁধে কোটটা গায়ে চড়িয়ে দিই। আয়নায় মুখ দেখে ভালো ভাগে না। দাড়িগুলোর কালো মাথা দেখা যাচ্ছে। অথচ গতকালই দাড়ি কামিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি 'সেফটি রেজার' বের করে ঐ অবস্থায়ই কয়েক পোঁচ টেনে নিই। কিন্তু কোটের কলারটায় সাবানের ফেনা লেগে যায়। তোয়ালে দিয়ে সেটা মুছে চুলে চিরুনি চালাই আর একবার। তারপর জুতো জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে আর এক দফা আয়নায় মুখ দেখে বেরিয়ে পড়ি।

ন'টা বাজে। পথ সংক্ষেপ করতে গিয়ে একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকি। গলি নয় ঠিক। দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। গা বাঁচিয়ে একজন যেতে পারে কোনমতে। মাঝ পথে গিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হয় আমাকে। একজন বুড়ো ভদ্রলোক

আসছিলেন ওদিক থেকে। দেহের আয়তন তার নিতান্ত ছোট নয়। তাই কোলাকুলিটা হয়ে যায় ভালোভাবেই। তারপর একজন, আরো একজন, আরো একজন। কোলাকুলি সেরে বেরিয়ে যান তারা। কোলাকুলিটা যদিও সকলের সাথে সমান জমে না, তবুও মনে হয় মানুষে মানুষে হানাহানির এ সময়টায় অজানা-অচেনায় এরকম কোলাকুলি বড় দুর্লভ।

আর মাত্র কয়েক কদম পার হলেই বড় রাস্তা। দেয়াল ছেড়ে সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি এক ভদ্র মহিলা গলিটায় ঢুকে পড়েছেন। আমার সামান্য কয়েক কদমের পথটুকু পার হবার সুযোগ না দিয়ে এগিয়েই আসছেন তিনি। এবার আর উপায় নেই। তাড়াতাড়ি পিছু হেঁটে শেষটায় উপায় করতে হয় আমাকেই।

দেয়ালে ঠেস্ দেয়ায় ছাতলা লেগেছিল কোটে। রুমাল বের করে ঝেড়ে আবার পথ দেখি আমি। এবার আর সোজা পথে নয়। সোজা পথটাই দেখছি কঠিন বেশি। বেনেপুকুর লেন ঘুরে, লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে ইলিয়ট রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াই।

ধর্মঘটের জন্যে ট্রাম বন্ধ। আমাকে যেতে হবে ৮ নম্বর বাসে। এক-এক করে কয়েকটা বাস চলে যায়। কতবার হাতল ধরতে গিয়ে পিছিয়ে যাই। সাহসে কুলোয় না। লোকসব বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। নিরাশ হবার পাত্র আমি নই। দাঁড়িয়ে থাকি, দেখি অন্তত একটা পা রাখবার জায়গাও যদি মিলে যায়।

একটা বাস এসে থামে। পা রাখবার জায়গা নেই। তবুও সব লোক ছুটোছুটি করছে, কে কার আগে উঠবে। চাকরি ঠিক রাখার কি প্রাণান্ত চেষ্টা। একটা লোক নেমে যায় ড্রাইভারের কুঠরি থেকে। মহা সুযোগ! পাশের কয়েকজনকে টেক্কা মেরে চট করে উঠে পড়ি আমি। চাকরি গেলে আমার চলবে না। হঠাৎ আমার বুকে ধাক্কা মেরে একজন চেঁচিয়ে ওঠে,—মানুষ, না জানোয়ার!

লোকটা কি গণক নাকি! গণকের মত ঠিকই তো বলেছে সে! আমি জঙ্গলেই তো ছিলাম এদ্দিন!

লোকটাকে ধন্যবাদ দেয়ার ইচ্ছে হয়। কিন্তু সাহস হয় না। ঘাড়টা নুইয়ে গায়ে গায়ে মেশামেশি হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মেশামেশিটা আগের কোলাকুলির মত প্রীতিকর হয় না। আমি শেষে ঢুকে অনেকের অসুবিধে করেছি। ঠেলা-ধাক্কাটা তাই আমার দিকেই আসছে বেশি করে। পাঁজরার হাড়গুলো চাপ খেয়ে ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে। আর দেরি নয়, পরের স্টপে থামতেই আমি নেমে যাই।

এতক্ষণ দম বন্ধ হয়েছিল যেন। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসকে সজীব করে নিই খোলা বাতাসে। স্যুটটার দিকে তাকিয়ে মায়া হয়। ভেতরের ঘামে আর ওপরের ঘষায় ইস্ত্রি ভেঙ্গে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। এবার পা দুটোকে সম্বল করেই ছুটব ঠিক করলাম।

কলকাতা এসেছিলাম অনেকদিন আগে একবার। পথ-ঘাট ভালো মনে নেই। পথ চেয়ে পথ চলি। কিন্তু তার চয়েও বেশি চেয়ে দেখতে হয় পথচারীদের পোশাকের দিকে।

এই পোশাক ছাড়া কার কি ধর্ম জানবার উপায় নেই। কারণ ধর্মের কথা গায়ে কিছু লেখা থাকে না। সব ধর্মধারীদের চেহারাই মানুষের চেহারা। আমার চেহারা দেখে কিন্তু কারো বুঝবার যো নেই আমার ধর্ম কি। কারণ আমার মানুষের শরীরটাকে আন্তঃধার্মিক পোশাকে ঢেকে নিয়েছি। তাই বলে কি আমি নিরাপদ ? মোটেই না। আমার বিপদ বরং বেশি। আন্তঃধার্মিক পোশাকে মানুষের চেহারা হলেও যে কোন দিকের চাকু খাওয়ার ভয় আছে আমার। মুসলমান আমাকে হিন্দু ঠাওরালে, আর হিন্দু মুসলমান ঠাওরালেই হল!

ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করে। মন ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এক শ' তিরিশ টাকার চাকরিটার ভার ছেড়ে দিই পা দুটোর ওপর। শুধু তাই নয়, মনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেহের ভারটাও।

এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় পা দিয়ে থমেক দাঁড়াই। কাছাকাছি একটা প্রাণীও দেখছি না যে! বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। সুমুখের একটা দোতলা বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কয়েকজন কি যেন দেখছে রাস্তার দিকে। ওপর থেকে নিচের দিকে চোখ নামাতেই চোখ ফিরে আসে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। চিনতে ভুল হয় না। মানুষ! হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত মানুষ। রক্তের রাঙা স্রোত ড্রেনে গিয়ে মিশেছে।

নিমেষে পেছন ঘুরে অন্য পথ ধরি। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও তাকাই না ফিরে। কিন্তু কে যেন গর্জে ওঠে,—ঠায়রো।

দু'জন সার্জেন্ট রিভলবার হাতে এগিয়ে আসে। আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে তারা। কিন্তু ফাঁসাতে পারে না। নিয়োগ-পত্রটা পকেটেই ছিল। সেটা দেখিয়ে রেহাই পেয়ে যাই।

এবার আরেকটা রাস্তা ধরে হাঁটি। হাঁটি সুমুখে পেছনে চেয়ে। মারটা নাকি পেছন থেকেই আসে! এক একজন লোক চলে যায় পাশ কেটে, মনে হয় এক একটা ফাঁড়া কেটে যায় আমার। আমার সতর্ক চোখ দুটো আড়চোখে তাকায় সবার দিকে। কিন্তু তারাও যে সতর্ক দৃষ্টি মেলে আমারই দিকে তাকায়! আমাকে—আমার হাত দুটোকেই বোধ হয় তাদের ভয়। তাদের ভীত চাউনি দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আমিও আমার অনুগত হাত দুটো ছাড়া আর কারো হাতকে বিশ্বাস করতে পারি না।

কিছুদূর আগে ডান দিকে একটা পাশগলি। গলির মুখে তিনটে লোক। তাদের পোশাক দেখে চমকে উঠি। তাদের ভাবগতিকও কেমন যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমার বুকের ভেতরটায় ঢিপঢিপ শুরু হয়েছে। আশেপাশে লোকজন নেই। পেছনে তাকিয়ে দেখি এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তরুণী উঁচু-গোড়ালি জুতো পায়ে আসছে গট্‌গট্‌ করে। আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায়। আমি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যাই। গলির মুখের লোকগুলোকে বোঝাতে চাই, আমি তরুণীটির জন্যেই অপেক্ষা করছি। তারই সাথী আমি। কিন্তু তারা বুঝতে চাইলে হয়। আমার যে রকম গায়ের রঙ! অবশ্য এরকম রঙের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের অভাব নেই কলকাতা শহরে।

আমার পোশাক দেখে লোকগুলো না হয় আমাকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ঠাওরাল। কিন্তু তরুণীটিকে কি বোঝাব ? আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি মনে করবে সে ?

আমি উবু হয়ে বাঁ পায়ের জুতো খুলি। জুতোর ভেতর কাঁকর ঢুকেছে এমনি ভান করে জুতোটা উপুড় করে ঝেড়ে নিই কয়েকবার। তারপর আবার পায়ে ঢুকাই। তরুণীটি আমার কাছে এসে গেছে। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে এবার তার পাশাপাশি চলতে শুরু করি। এখন ঠিক মনে হচ্ছে—রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দম্পতি। অন্যের কি মনে হচ্ছে জানি না। আমার কিন্তু ওরকমই মনে হচ্ছে। এক পা, দু'পা করে গলির মুখ পার হয়ে যাই।

ফাঁড়া কেটে গেছে। আমার নীরব সঙ্গিনী একবার কটমট করে আমার দিকে তাকায়। তার চোখের দিকে চেয়ে আমার মনটা মিইয়ে যায়। কিন্তু তবুও তার সঙ্গ ছাড়তে ভরসা পাইনে।

পাশাপাশি হেঁটে আরো কিছুদূর এগিয়ে যাই। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলে সে,—আমার পিছু নিয়েছ কেন ?

—না-না—। আমি থতমত খেয়ে যাই।

—না মানে! বহুক্ষণ ধরে আমি লক্ষ্য করছি। পুলিশ ডাকব ?

—না-না, মানে—ইয়ে, মানে গুণ্ডার ভয়ে—

—গুণ্ডার ভয়ে!

—হ্যাঁ, তাই—তাই আপনার সাথে সাথে এলাম।

—অবাক করলে! এক জোয়ান পুরুষ, তাকে রক্ষা করবে মেয়ে মানুষ! আচ্ছা কাপুরুষ তো! অবজ্ঞার হাসি তরুণীটির মুখে।

কিছুদূর গিয়ে মহিলা বাঁ'দিকে এক গলিতে ঢুকে পড়ে। আমি মোড় নিই ডান দিকে।

পাশ থেকে একটা হাত এগিয়ে আসছে না আমার দিকে!

'উঃ মাগো' বলে লাফ দিয়ে সরে যাই কয়েক হাত। ফিরে দেখি একজন জটাধারী ফকির হাসছে আমার অবস্থা দেখে। এগিয়ে এসে সে বলে,—ভয় পেলি নাকি ? দু'দিন খেতে পাইনি। দুটো পয়সা দে।

রীতিমত ঘাম দিয়েছে আমাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তবু হাতে চাকু না থাকার জন্যে ফকিরটাকে ধন্যবাদ দিই মনে মনে আর পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে তার দিকে ছুড়ে মারি।

চৌরঙ্গী এসে পড়েছি। একটা লোক হঠাৎ আমার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে,—ফটো তুলবেন ? আসুন। এক টাকায় তিন কপি।

লোকটার কথার জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কিন্তু ভুল হয়ে গেল। মানুষের ভয়ে ভীত মানুষের ফটোটা তুলে রাখা উচিত ছিল আমার।

এক পয়সায় একটা 'পাসিং শো' সিগারেট কিনে রশির আগুনে ধরাতে যাব, হঠাৎ কার স্পর্শে শিউরে উঠি।

চেয়ে দেখি, আমাদের সুভাষ মুচকি হাসছে। সহপাঠী বন্ধুর আলিঙ্গনে বুকের ভেতরটা যেন ভিজে ওঠে। কিন্তু ওর বুকটা শক্ত লাগল না! জামার ওপর হাত রাখি। তাই তো!

সুভাস হেসে বলে,—হাত দিয়ে দেখছিস কি ?

—দেখছি, মানে—তোর বুকটা শক্ত লাগছে কি ?

—শক্ত লাগছে ? হুঁ হুঁ হুঁ! এ জিনিষ দেখিস নি কখনো। লোহার তারের গেঞ্জি। একেবারে নয়া আবিষ্কার!

—নয়া আবিষ্কার!

—হ্যাঁ, এ বর্ম ভেদ করবে চাকু ? উঁহু—!

সুভাষের জামার ওপর হাত দিয়ে দিয়ে আঁচ করতে পারি, লোহার তার দিয়ে তৈরি হাতাকাটা গেঞ্জি। মন্দ জিনিষ নয়। সহসা আঘাত করে কিছু করতে পারবে না।

আমি হেসে বলি,—কিরে চাকু-টাকু লুকোন নেই তো ?

—নেই তো কি! নিশ্চয়ই আছে। এক্ষুণি তোর বুকে বসিয়ে দেব। তোর রক্ত দিয়ে ফোঁটা-তিলক কেটে কালী পূজো করব।

—এখানে কি করিস ?

—পড়ি আর্ট স্কুলে।

—আর্ট স্কুলে! ঠিক আছে। শোন্ তোকে একটা ছবি আঁকতে হবে। মানুষের ভয়ে মানুষের চেহারা কেমন হয়, ফুটিয়ে তুলতে হবে সে ছবিতে। পারবি তো ?

—তা দেখব চেষ্টা করে।

আরো দু'-এক কথা বলে বিদেয় হই তাড়াতাড়ি। দশ বছর এক সাথে পড়েছি, খেলাধুলো করেছি। আজ দশটা মিনিটও কথা বলবার ফুরসত নেই। গোলামী ঠিক রাখতেই হবে।

হোয়াইটঅ্যাওয়ের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। সাড়ে দশটা বাজে। আমারটা তা হলে বন্ধ হয়ে আছে ? তাই তো! এই রে চাকরি বুঝি গেল! ডালহৌসী পর্যন্ত হেঁটে গেলে দেরি হয়ে যাবে অনেক। পকেট হাতড়ে আট আনা পয়সা পাওয়া যায়। বাস ভাড়া ও টিফিনের পয়সা। রিক্সা ডেকে উঠে পড়ি। টিফিন চুলোয় যাক।

অফিসে পৌঁছে শুনি হাজিরা বই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ঘরে চলে গেছে। রোজ সোয়া দশটার সময় হাজিরা বই তাঁর ঘরে চলে যায়। যারা দেরিতে আসে, তাদের কৈফিয়ত আদায় করে হাজিরা বইয়ে সই করতে দেন তিনি।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ঘরে ঢুকি। শ্বেতাঙ্গ সায়েব। কিছুক্ষণ আগে, অফিসের গেট পার হয়ে আসার সময় তাঁকে গাড়ি করে আসতে দেখেছি। আমাকে দেখে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বলেন,—এত দেরি করে এসেছ কেন ? এখন এগারোটা বাজে। এরকম দেরি করে এলে চলবে না, বুঝলে ?

অফিসে নতুন ঢুকেছি, তাই বোধ হয় বেশি কিছু শুনতে হয় না। কিন্তু আমার মেজাজটা ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বলতে ইচ্ছে হয়,—আমার পায়ে তো আর চাকা লাগান নেই আপনার গাড়ির মত!

হাজিরা বইয়ে নাম সই করতে যাব, ফাউন্টেন পেনটার জন্যে ওপরের পকেটে হাত দিই। কই, নেই তো! এ পকেটে ও পকেটে খুঁজি। কিন্তু পাওয়া যায় না আর। সায়েবের

টেবিল থেকে কলম তুলে হাজিরা বইয়ে সই করে বেরিয়ে আসি। পকেটগুলো হাতড়ে দেখি আবার। মেসে রেখে আসিনি। পকেটে তুলেছিলাম, স্পষ্ট মনে আছে। তা হলে ? বাসের মধ্যে আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে জানোয়ার বলেছিল যে মানুষটা তার কর্ম নয় তো ?

আমার পোস্টিং হবে কোন এক শাখা অফিসে। অফিসের বড় কর্তা কতগুলো ফাইল দিয়েছেন। পোস্টিং না হওয়া অবধি কাজকর্ম বুঝে নিতে হবে। ফাইলগুলোয় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কলমটার বিচ্ছেদে মন বসে না। পাঁচ মাস বাড়িতে পাঁচ টাকা করে কম পাঠিয়ে পঁচিশ টাকায় কিনেছিলাম কলমটা। জোর করে কাজে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু বারবার কলমটার কথাই মনে পড়ে।

আমি কথা বলি কম। জঙ্গলে তাই এদ্দিন টিকতে পেরেছিলাম। কিন্তু লোকালয়ে অনেকেই বোকা মনে করে। তার প্রমাণ অফিসের মাঝেও আজ পেলাম। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশের মধ্যে ফাইল খুলে পড়ছি চুপচাপ। এমন সময় মিস্টার জাফর আমার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলেন,—এ যোগগুলো করে দিন তো। দেখবেন, ভুল হয় না যেন।

লম্বা লম্বা যোগ। মনোযোগ দিয়ে না করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। একমনে যোগ করছিলাম। হঠাৎ মিহি হাসির শব্দে আমার মনোযোগ টুটে যায়। মাথা তুলে দেখি—মিস ঘোষের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ গল্প জমিয়েছেন মি. জাফর। বারে বাঃ! যোগ করে মরছি আমি, আর যোগাযোগ করছেন উনি। আচ্ছা লোক তো!

অনেকক্ষণ গল্প করে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন মিঃ জাফর,—কদ্দূর করলেন ? হয়েছে ?

অফিসে চুপচাপ বসে থাকলেও এর মধ্যে অনেককেই আমি চিনে নিয়েছি। মি: জাফরকে চিনি না, এমনি ভাব দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলি,—না স্যার, এখনো হয় নি। যোগাযোগের কাজে আমি খুবই কাঁচা। আর একটা কথা স্যার, মাফ করবেন! আপনার সাথে এখনো আলাপ হয় নি। আপনি কি চীফ অফিসার ?

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুখখানা হাঁড়ির মত করে চলে যান মি: জাফর। আমি জানি, জাফর আলী ষাট টাকার কেরানি। হেড অফিসের লোক কিনা, তাই সুযোগমত শাখা অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর ওপরও ছড়ি ঘোরাতে চায়।

পাঁচটা প্রায় বাজে। ফাইলপত্র আলমারিতে রেখে বেরিয়ে যাব, এমন সময় মিস ঘোষ ডাকেন,—শুনুন তো।

মিস্ ঘোষ ষাট টাকা মাইনের টাইপিষ্ট। কাছে যেতে একটা ফাইল দেখিয়ে বলেন, —এটার মধ্যে কতগুলো টাইপ-করা কাগজ আছে। মি. জাফরকে নিয়ে এগুলো কম্পেয়ার করে রাখবেন। কাল আমার আসতে দেরি হবে।

অনুরোধ নয়, একেবারে আদেশ। আমার রাগ ধরে। এরা পেয়েছে কি ? আমি নিরীহ বলেই কি এভাবে ফ্যাগ খাটতে হবে ? কিন্তু নিরীহ হলেও সাপের মন্তর জানি আমি। বলি,—মাফ করবেন, ম্যাডাম। আপনার সাথে এখনও পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। আপনি নিশ্চয় অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

মিস্ ঘোষ ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি, মন্তরটা একটু কড়া হয়ে গেছে। কিন্তু কি করা যাবে ? হুকুম দেয়ার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল তাঁর।

অফিস থেকে বার হই। আবার সেই বাস, লোকজন, ভিড়। সেই পথ, পথচারীর ভীত চাউনি। মনটা দমে যায়।

হেঁটে হেঁটে চৌরঙ্গী পর্যন্ত আসি। কিন্তু পা আর চলে না। চলবার কোন হেতু নেই যে! ভোরে যা খেয়েছি, আর এ পর্যন্ত এক পেয়ালা চা-ও না। কার্জন পার্কে বসে পড়ি। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। ভিড় কমলে বাসেই যাব।

সাড়ে ছ'টার সময় বাসে একটু জায়গা পাওয়া যায়। পঁ-পঁ করতে করতে বাস ছুটছে। এত ভিড়, বাইরের কিছুই দেখা যায় না। বুঝতে পারছি না, কোন্ রাস্তা ধরে চলতে গাড়ি।

বুম্-ম্—

আবার বুম্-ম্—

ভীষণ শব্দ। কানে তালা লেগে গেছে। শুনতে পাই না কিছু। শেয়ালের ভয়ে খাঁচার মোরগের মত করছি আমরা।

তারপর কোন দিক দিয়ে কেমন করে বাসখানা চলে এল, অত খেয়াল নেই। কয়েক জনের মুখে শুনলাম, বাসের পা-দানির ওপর থেকে দু'জনকে দু'পেয়ে শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। আর অনেকের হাত-মুখ, নাক-কান ছিঁড়ে গেছে বোমার আঘাতে।

ঘরের কাছে এসেও আর একবার শিউরে উঠি। অক্ষত দেহে পৈতৃক-প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছি আমি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিথিল শরীরটাকে টেনে এনে বিছানায় ঢেলে দিই। মানুষের মাঝে একদিন চলেই মুষড়ে পড়েছি আমি। আমার সমস্ত রাগ ঘৃণা আজ মানুষের ওপর।

চোখ বুজে ভাবছি—পদত্যাগ-পত্রটা প্রত্যাহার করার এখনো হয়তো সময় আছে। আমার জন্যে বন-বিভাগের চাকরিটাই ভালো। মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে শহরে থাক। আমি বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হব।

৪৯ বেনেপুকুর লেন, কলকাতা
২২ মাঘ, ১৩৫৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বোম্বাই হাজী

মরা মানুষের শত্রু নেই—লোকে বলে। কিন্তু আবিদ আলী হাজীর ছিল। যদি না-ই থাকবে তবে তাঁর অপঘাত মৃত্যুর খবর শুনে লোকে হাসাহাসি করবে কেন ? হাসাহাসি শুধু নয়, তাঁর মৃতদেহ দাফন নিয়ে যে রকম ঝগড়া বেধেছে তাতে ঢাল-শড়কির তলব হওয়া বিচিত্র নয়।

ঝগড়া বেধেছে দুই দলে।

হাজী বাড়ির দল বলে,—হাজী বাবার অছিয়ত মত তাঁর মাজারেই কবর দিতে অইব।

ফকির বাড়ির দল বলে,—না কিছুতেই না। বোম্বাই হাজীকে হাবীবাবার মাজারে কবর দেওয়া চলব না।

হাজী বাড়ির কয়েকজন মাজারে কবর খুঁড়তে শুরু করেছিল। ফকির বাড়ির দল লাঠি-ঠ্যাংগা নিয়ে মার-মার করে এগিয়ে গেলে তারা খোন্তা-কোদাল ফেলে পালিয়ে যায়।

ফকির বাড়ির লোকজন মাজার পাহারায় লেগে যায়। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে :

—দ্যাখলা তো মিয়ারা, পাপ পাপের বাপেরেও খাতির করে না, হ্যাঁ হ্যাঁ-হ্যাঁ! তাল কি আর জায়গা পাইল না পড়নের! পড়বি তো পড় এক্কেবারে বোম্বাই হাজীর মাথায়!

গাঁয়ের ডাকসাইটে মোড়ল বাদশা সরদার গিয়ে হাজির হয় মাজারে। তিনি কথার লেজ ধরে শুরু করেন,—আল্লার মাইর, দুনিয়ার বাইর। আল্লায় না মারলে কি আর এমুন ঠিক ঠিক মাথার তালুতে তাল পড়ে ? তোমরা কিন্তু হুঁশিয়ার! হোন্‌লাম, ওরা সাজাসাজি করতে আছে। সাবেদ মোড়ল যোগ দিছে ঐ দলে। আমিও দেইখ্যা নিমু, বাদশা বাঁইচ্যা থাকতে হাজীবাবার মাজারের মর্তবা নষ্ট করে কোন ব্যাডা! আমি যাই, লোকজনরে খবর দিয়া রাখি গিয়া।

—মোড়ল ঠিক কথাই কইছেন। বোম্বাই হাজীরে এইখানে কবর দিলে হাজীবাবার মাজারের মর্তবা আর থাকব না কিছু।

—একেবারেই বরবাদ অইয়া যাইব। এই মাজারে ধন্না দিলে মানুষের কত মুশকিল আসান অইয়া যায়!

—তোমরা তো জান, আমার খালু শ্বশুর মহী লস্কররে খুন কইর‍্যা খালাস পাইছিল। কিন্তু কার উছিলায়, তা তো তোমরা জান না! সে যখন হাজতে, তখন বাবার মাজারে

পাঁচ ট্যাহা সোয়া পাঁচ আনা আর এক শ' একটা মোমবাতি মানত করছিল! তারপর জজের কি ক্ষমতা তারে ফাঁসীতে লটকায়!

—তবে হোন আর এক বিত্তান্ত। নলডাঙ্গার রহিমুদ্দিরে তো চিন তোমরা। ওর দাদা আছিল আঁটকুড়া। এই মাজারে আইসা কান্দাকাটার পর ষাইট বছর বয়সে এই রহিমুদ্দির বাপের জন্ম হয়।

এ রকম অশ্রুত ও বহুশ্রুত অনেক মুশকিল আসান, মনোবাঞ্ছা পূরণ ও দুরারোগ্য ব্যারাম-ব্যাধি মুক্তির কথা বলাবলি হয়। হাজীবাবার মাজারে হত্যে দিয়ে লুলা ও কুষ্ঠরোগী ভালো হয়েছে, অন্ধ চক্ষু ফিরে পেয়েছে, এরকমও শোনা যায়।

একই বংশের দুই অংশ দুই বিবদমান দল। আর দুই দলেরই মূল হাজীবাবা।

হাজীবাবা এ বংশের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ। তিনি ছিলেন ক্বামেল ফকির। দুনিয়া ও আখেরাতের এলেম-কামাল, শরীয়ত-মারেফত; বালা-মুসিবতের তাবিজ-কবচ, তুক-তাক ইত্যাদি অনেক গুণ-কেরামতি হাসিল করেছিলেন তিনি। মানুষের মোখালিফ ভূত-পেত্নী, জিন-পরী, দেও-দানো ছিল তাঁর হুকুমের গোলাম। লোকের মুখে মুখে শোনা যায় তাঁর অলৌকিক কাহিনী। পূর্ব বঙ্গের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তাঁর দু'চার ঘর মুরীদ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি অছিয়ত করে যান—বয়োজ্যেষ্ঠ হলেই তাঁর বংশধরদের মধ্যে কেই তাঁর গদির উত্তরাধিকার লাভ করবে না। গদিনশীন হতে হলে অবশ্যই হজ করে আসতে হবে। আর হজ করবার সৌভাগ্য যাদের হবে, তারা হাজীবাবার সমাধিক্ষেত্রে শেষ শয্যা গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করবে।

হাজীবাবার বড় ছেলে হাজী হেদায়েতুল্লাহ। হঠাৎ ইন্তেকাল হওয়ায় তিনি তাঁর বড় বিবির ঘরের বড় ছেলে কেরামতুল্লাহ্‌কে ফকিরালির সব কিছু শিখিয়ে যেতে পারেন নি। তবুও কেরামতুল্লাহ্ ফকিরের সাগরেদমুরীদ ছিল অনেক। হাজীবাবার উরস শরীফ উপলক্ষে যে নজরানা পাওয়া যেত, তা দিয়ে বেশ জাঁক-জমকের সাথেই চলে যেত। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি মক্কাশরীফ যান। কেউ বলে,—তিনি মক্কাশরীফ যাওয়ার পথে ইন্তেকাল করেন। কেউ বলে,—তিনি পাঁচ বছর মক্কাশরীফ থাকার নেয়াত করে গেছেন। পাঁচ বছর পরে ফিরে আসবেন।

কেরামতুল্লাহ্ ফকিরের দুই ছেলে—আলী নেওয়াজ ও গুল নেওয়াজ। জ্যেষ্ঠ আলী নেওয়াজ পিতার ফকিরী বিদ্যার সামান্য কিছু পেয়েছিলেন। গুণ-কেরামতি শিখিয়ে না গেলেও কেরামতুল্লাহ্ ফকির ছেলেদের জন্যে চার কলসী মোহর ও সোনা-গয়না মাটির নিচে পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন। মক্কাশরীফ যাওয়ার আগে দুই ছেলেকে বাঘমারা ভিটায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েও ছিলেন। গাবগাছের দশ হাত পশ্চিমে ও তেঁতুল গাছের সাত হাত দক্ষিণে মোত্রা ঝোপের মধ্যে জায়গাটা।

পিতা ইন্তেকাল করেছেন—বিশ্বাস করেন আলী নেওয়াজ। এবার হজ করে গদিনশীন হওয়া দরকার। তিনি একদিন গুল নেওয়াজকে বলেন,—চল, এইবার কলসীগুলো তুইল্যা ফেলি। খোদায় বাঁচাইয়া রাখলে আগামী বছরেই মক্কাশরীফ যাওয়ার নেয়াত আছে ইনশাল্লাহ।

গুল নেওয়াজ বলেন,—আব্বা হুজুরের তো কোন সঠিক খবর পাইলাম না। তা ছাড়া আল্লার বেশাতরা কেউ এখনো সিয়ানা হয় নাই। ওরা লায়েক হউক। বিয়া-শাদী দ্যান। তারপর ওরা সংসারের ভার-ভাবনা বুইঝা নিয়া যখন আপনারে খালাস দিব, তখন নির্ভাবনায় হজে যান। ভাবনা-চিন্তার মন লইয়া হজে গেলে কি তা কবুল হইব খোদার দরগায় ?

কথাগুলো মনে ধরে আলী নেওয়াজ ফকিরের। তিনি বলেন,—ভাল কথাই কইছ। এখন হজ কইরা আসলে তো আর সংসারের পর খেয়াল থাকব না। আর হজ করার পর সংসার ছাইড়া খোদার এবাদত-বন্দেগীতে মন দিলে বাচ্চা-কাচ্চাগুলো কেঁউকেঁউ-ফেউফেউ কইর‍্যা মরব।

তারপর পাঁচ বছর চলে যায়। একদিন গুল নেওয়াজই বড় ভাইকে হজে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

আলী নেওয়াজ বলেন,—হ্যাঁ, এইবার সংসারের বোঝা মাথার থিকা নামাইছি। চল, আইজ রাত্রে বাঘমারার ভিটায়।

—হ্যাঁ, চলেন।

গভীর রাত্রে খোন্তা-কোদাল হাতে দুই ভাই গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে খুঁড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু আশ্চর্য! চারটে কলসীর একটাও পাওয়া যায় না। দুই ভাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। রাতারাতি তাঁরা সারা ভিটে খুঁড়ে ফেললেন। কিন্তু কলসী চারটে পাওয়া গেল না তো পাওয়াই গেল না!

গ্রামে জানাজানি হয়ে যায় ব্যাপারটা। কেউ কেউ বলে, 'যক্ষে লইয়া গেছে টাকার কলসী।'

গুল নেওয়াজ বড় ভাইকে বলেন,—আমার মনে হয় যক্ষেই লইয়া গেছে। শুনছি, মাটির নিচে বেশি দিন থাকলে কলসীর পা গজায়।

আলী নেওয়াজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। বলেন,—কি জানি, গায়েবের মালিক আল্লাহ্, আল্লাই জানে।

আলী নেওয়াজ ফকিরের আর হজে যাওয়া হল না। হজে যাবেন কি! ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-শাদীতে বে-আন্দাজ খরচ করে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে বসে আছেন। যে ভরসায় ছিলেন তা যে এভাবে হাওয়া হয়ে যাবে, তা কে জানত ? অন্য দিকে গুল নেওয়াজ ফকিরের টাকার দবদবি স্পষ্ট বোঝা যায়। দাদার আমলের ঘর-দোরের জায়গায় তিনি কোঠাবাড়ি তুললেন। হাজীবাবা ও অন্যান্য পূর্ব পুরুষদের জরাজীর্ণ মকবরাগুলোর মেরামত করালেন। তাঁর এ কাজে অনেকেই খুশি হয়। আবার কানাকানিও শুরু করে কেউ কেউ। তারপর তিনি যখন হজ করে এসে গদিনশীন হন, তখন গাঁয়ের লোক, এমন কি সাদাসিধে আলী নেওয়াজও বুঝতে পারেন, কলসীগুলো কোন্ যক্ষের সিন্দুকে গিয়ে উঠেছে।

বুড়ো আলী নেওয়াজ সহ্য করেন। কিন্তু তাঁর জোয়ানমর্দ ছেলেগুলো ফুলে-ফুঁসে ওঠে আক্রোশে। রাগে-ক্রোধে তারা গুল নেওয়াজ হাজীর নাম দেয় কলসী পীর। দুই

ভাই-এর ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বেধে যায় তুমুল। দু'-এক দফা কিলাকিলি-ঢিলাঢিলিও হয়। আলী নেওয়াজ ফকির দেখলেন, এ বাড়িতে থাকলে আর শান্তি হবে না কোন দিন। জীবনের শেষ ক'টা দিন শান্তিতে কাটাবার জন্যে তিনি বাঘমারা ভিটায় নতুন বাড়ি করলেন। এই থেকেই হাজীবাবার বংশ হাজীবাড়ি ও ফকির বাড়িতে ভাগ হয়ে যায়।

কলসী পীরের ছেলে আবিদ আলী হাজী। হজ করে আসার ছয় মাসের মধ্যে তাঁরও খেতাব একটা জুটল। একদিন এক বিয়ের মজলিসে মক্কা-মদীনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি নাকি গোলমাল করে ফেলেছিলেন। যে হাজী মক্কার জম্‌জম্‌কে মদীনায় আর মদীনার রসূলুল্লাহর রওজা শরীফকে মক্কায় নিয়ে ফেলতে পারেন আর জেদ্দা বন্দর ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত বলে বর্ণনা দিতে পারেন, তাকে যদি কেউ বোম্বাই হাজী বলে তবে তার দোষ দেয়া যায় না।

এই ঘটনার পর বোম্বাই হাজী (আসল নাম এখন চাপা পড়ে গেছে) আর কোন দিন কোন মজলিস-দরবারে যান না। কারো সাথে চোখ তুলে কথা বলনে না। মুখে যাদের লাগাম নেই তারা তাঁকে দেখলেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে,—'এই রে, আইজ যাত্রাডাই খারাপ!' ইস্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত তাঁকে দেখলে একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'ওরে মতি, বল দেখি জেদ্দা বন্দর কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত ?'

—এ আর জানি না! ফোরাত নদীর তীরে।

এ সব ঠাট্টা-টিটকারি যাহোক সহ্য করার মতো। কিন্তু ফকির বাড়ির লোক পুরাতন আক্রোশে যা গালাগাল আর টিটকারি দেয় তা বলতে গেলে না পোড়ে আগুনে, না গলে পানিতে। বোম্বাই হাজীর ভক্ত মুরীদ অনেকেই খারিজ হয়ে গেছে। যারা এখনো যাওয়া-আসা করে, তারা এ সব শুনে বলে,—হুজুর, আপনার হুকুমের একটু হুঁ পাইলে দেইখ্যা নিতাম, ওদের জবানের শায়েস্তা করতে পারি কি না।

বোম্বাই হাজী তাদের বুঝ দেন,—উহুঁ, জান না তোমরা। ওরা আমার বেহেশতের পথের কাঁটা সাফ করতে আছে। আর ঐ কাঁটা বিছাইয়া দিতেছে নিজেগ রাস্তায়।

এমনি করে বোম্বাই হাজী অসীম ধৈর্যের সাথে চোখ-কান বুজে হজম করেন অনেক গালাগাল আর টিটকারি। মুখ ফুটে প্রতিবাদ করেন নি। মাঝে মাঝে দুনিয়াদারীর ওপর বিতৃষ্ণা এসেছে। দুঃখ-বেদনায় কখনো বা মনে মনে মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছেন।

বোম্বাই হাজীর প্রত্যাশিত মৃত্যু আসে, কিন্তু আসে অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিকভাবে। ভাদ্র মাস। সুবেহ্ সাদেকের সময় মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে ছিল এক তাল গাছ। উঁচু গাছ থেকে চার আঁটিওলা তাল তাঁর মাথার তালুসই হয়ে পড়ে। ভোরবেলায় দেখা যায়, তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে তাল গাছের নিচে।

এ রকম মৃত্যু সহানুভূতি জাগিয়ে তোলা দূরে থাক, শত্রুপক্ষের মনে টিটকারির দুর্বার লোভ জাগিয়ে দেয়। তারা রসিয়ে রসিয়ে বলে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। পীর হওনের কী লালচ! হায়-হায়-হায়! তোর বাপ গদির লোভে বোচকা মাইর‍্যা হাজী অইল। তুই আমাগ চউখে ধূলা দিতে গেছিলি। আল্লা কয়, সবুর, এমুন গজব দিয়া তোরে মারমু, মরণকালে না পাবি মাগ-পোলার মুখ দ্যাখতে, না পাবি এক ফোঁডা পানি!'

শেষ পর্যন্ত ঢাল-শড়কির তলব হয়। ফকির বাড়ির পক্ষে বাদশা সরদার আর হাজী বাড়ির পক্ষের সাবেদ মোড়ল জুটে গেছেন।

বাদশা সরদার তার লোকজনদের উদ্দেশ্যে বলেন,—তোমাগ কাছে পুরান কথা আর কি কইমু। বেবাক মানুষ জানে, এই ফকিরেরা অইতেছে হাজীবাবার গদির আসল হকদার। হাজীবাড়ির ওরা কলসী মাইর‍্যা বড় অইছে। ঐ কলসী পীরের পোলা বোম্বাই হাজীরে এই মাজার শরীফে কবর দিলে মাজারের ফজিলত বরবাদ অইয়া যাইব। এই এখন পর্যন্ত, এই মাজারের মাডি তাবিজ কইর‍্যা মাজায় দিলে শান্তিতে গব্ব খালাস অয়। রস, বাত, শূল বেদনা কমে, গলায় দিলে হাঁপি কাশ আরাম অয়। এই রকম আরো কত ব্যারাম-আজারে যে ফল অয় তার শুমার নাই। এমুন পাক মাডি আমাগ চউখের সামনে নাপাক অইব, আর আমরা ভেড়ী-বকরীর মত হাঁ কইর‍্যা চাইয়া দেখমু, এইডা কি অইতে পারে ?

সকলেই সায় দেয়,—না, এইডা কিছুতেই অইতে পারে না।

একজন কিছু সাহস সঞ্চয় করে বলে,—একটা কথা কই সরদারের পো। মরা মানুষ লইয়া এই রহম কাইজ্যা-কিরিঙ্কাল করনডা কি ভালো অইতে আছে ? এইডা আপসে মীমাংসা করণ যায় না ?

—আপস! তোমার কি মাথা খারাপ অইছে, অ্যাঁ ? ঐ রহম মরা মানুষ শিয়াল কুত্তায় খাইলে কি অয় ?

—না-না, এইডা কি কন সরদারের পো ? পীরের আওলাদ—

—পীরের আওলাদ এই বোম্বাই হাজী! তোর দেখছি মাথার মধ্যে ক্যাড়া ঢুকছে। এই কে আছে, ওরে খালের পানিতে গোট্টাচারি চুব দিয়া আন দেখি।

—থাক, থাক। আমি আর কথা কইমু না। আমার চুক অইছে।

—হুঁ, মনে থাকে যেন।

বাদশা সরদার গলা এক পর্দা চড়িয়ে আবার শুরু করেন,—আমার কথায় কান দিও। আইজ আমরা বর্তমান থাকতে যদি হাজীবাবার মাজারের অসর্মান অয়, তবে আমাগ কি দশা অইব, কও দেখি তোমরা ?

—কি দশা অইব আবার! বোম্বাই হাজীর যেই দশা অইছে, হেই দশা অইব। একজন বলে।

—হ, ঠিক কথাই কইছ। হেই দশা অইব। খোদার গজব পড়ব। তাই তোমরা পশ্চিমমুখী অইয়া কিরা কর। তোমরা বাঁইচ্যা থাকতে যেন এমুন বিপরীত কাজ না অয়।

—ঠিক ঠিক। সকলেরই এক রায়।

আলিমুদ্দিন ফকির বলে,—কই, ওনাগ তো কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। আমাগ হামকি-ধমকির চোটে ওরা ভয় পাইছে বুঝিন!

সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে হাজী বাড়ির দল। তাদের প্রধান সাবেদ মোড়ল বিপক্ষ দলের খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠিয়েছিলেন জাহিদ লস্করকে। সে চুপিচুপি ফকির বাড়ির পেছনের জঙ্গলে গিয়ে উঁচু গাব গাছে উঠে বসেছিল কিছুক্ষণ। ওদের সাজাসাজি দেখে

ফিরে এসে সে বলে,—অনেক মানুষ জমা অইছে ফকির বাড়ি। ঢাল-শড়কি, লাঠি-ঠ্যাঙ্গা যোগাড় করছে বেশুমার।

সাবেদ মোড়ল বলেন,—হঁ, বুঝতে পারছি, আমার দলের অনেকেই এখন উণ্ডা পাগড়ি বান্দছে। নাম লেখাইছে ঐ দলে।

তারপর নিজের ভীতি গোপন করে সবাইকে সাহস দেন,—তোমরা ঘাবড়াইও না। ওদের অনেক মানুষ, তাতে কি অইছে ? আল্লার নাম ইয়াদ কর। আল্লা পক্ষে থাকলে মারামারির সময় ওদের শড়কির গুতায় ওদেরই পেডের ঝুলি বাইর অইব।

সাবেদ মোড়ল ছিলিমের পর ছিলিম টেনে চলেছেন। এক সময়ে বোম্বাই হাজীর বড় ছেলে জাহানজেব এসে চোখ মুছতে মুছতে বলেন,—আর ঝগড়া-ফ্যাসাদ কইর‍্যা কি হইব মোড়লের পো ? আব্বাজানকে শিমুলতলার গোরস্থানেই মাটি দেই।

সাবেদ মোড়ল মনে মনে বিরক্ত হন। বলেন,—আইচ্ছা, আপনে যদি চান তবে তাই অইব। কিন্তু তা অইলে কি গদি রাখতে পারবেন ? বেবাক খুয়াইতে অইব। ইজ্জত যেডুক বাঁইচ্যা আছে তাও থাকব না।

জাহানজেব আর কোন কথা বলেন না। তিনি জানেন মাজারের আয়ে এখনো বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দেই চলছে সংসার। এ আয় বন্ধ হয়ে গেলে যে কি উপায় হবে, ভেবে পান না তিনি।

সদরুদ্দিন শেখ মামলাবাজ। সে বলে,—আমার বুদ্ধি যদি নেন তবে ফকির গুষ্ঠিরে দিনে দুফরে আমাবস্যা দ্যাখাইয়া দিতে পারি।

—কি বুদ্ধি আপনের। সাবেদ মোড়ল জিজ্ঞেস করেন।

—থানায় গিয়া খুনের 'কেস' লাগাইয়া দিয়া আসি এক নম্বর।

—খুন! সকলে চমকে ওঠে।

—হঁ, ফকির বাড়ির আলিমুদ্দিন ও জহীরুদ্দিন আসামী আর বাদশাহ্ সরদার হুকুমের আসামী।

—কিন্তু কি ভাবে খাড়া করবেন মামলাডা ?

—কিভাবে ? কইতে আছি। জাহানজেব মিয়া থানায় গিয়া কইব, হাজী সায়েব ফজরের নামাজ পড়বার জন্যে মসজিদে যাইতেছিলেন। ঐ সময় আসামীরা ইটা-মুগুর দিয়া তাঁর মাথায় বাড়ি মারে।

সাবেদ মোড়ল পরামর্শটা বিবেচনা করে দেখেন। কিছুক্ষণ পর বলেন,—উঁহ, এই ভাবে মামলা খাড়া করণ যাইব না। সাক্ষী-সাবুদে গোলমাল পাকাইয়া ফালাইব। শ্যাষে উণ্ডা ফাডকে যাইতে অইব আমাগই।

সাবেদ মোড়ল হুঁকোর নল টেনে নেন আবার। চোখ বুজে তামাক টানতে টানতে তিনি চিন্তা করছেন। তাঁর কপাল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক সময়ে তিনি গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। ঝাঁকির চোটে কল্কের আগুন ছড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক! নিজেকে সামলে নিয়ে মোড়ল উপস্থিত সকলকে বলেন,—তোমরা যার যার বাড়ি যাও এহন।

কাজ কাম সাইর‍্যা জোহরের নামাজের পর চইল্যা আইস। এর মইদ্যে একটা ফয়সালা অইয়া যাইব ইনশাল্লাহ্।

সকলেই চলে যায়। মোড়ল জাহানজেবকে নিচু গলায় বলেন,—সব মানুষ ফির‍্যা আইতে তিন-চার ঘণ্টা লাগব। এর মইদ্যেই সব ঠিক করতে আছি।

তারপর জাহানজেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলেন মোড়ল। জাহানজেব মাথা নাড়েন।

মোড়ল আবার বলেন,—খবরদার, কাউয়া-শালিকেও যেন জানতে না পারে। আপনারে গদিতে বসাইতে না পারি তো আমি হাতে চুড়ি দিমু। আপনার বাপজানের আমলে অনেক মুরিদান চইল্যা গেছিল। দ্যাখবেন তারা আবার আপনের মুরীদ অইছে।

একটু থেমে মোড়ল আবার বলেন,—উরুসের সময় তো আজকাল আর তেমন আয় হয় না। আমি এমুন ব্যবস্থা করতে আছি, দ্যাখবেন উরুসের আয় তিন ডবল বাইড়্যা গ্যাছে।

জাহানজেব বলেন,—আগে তো দাফনের ব্যবস্থা করেন, তারপর—

—সব অইব, সব অইব। তবে একটা আর্জি, মেলার খাজনা আদায়ের ভার দিতে অইব আমারে। যেই ট্যাকা আদায় অইব তার দশ আনা আপনার আর....।—কথা শেষ করেন না মোড়ল।

উরসের সময় এখানে মেলা বসে। আগের দিনে জমজমাট মেলা বসত। দোকানপাটে ছেয়ে যেত মোহনপুরের ময়দান। আসত সার্কাস, ভোজবাজি, ঘোড়া-চক্কর, রাধা-চক্কর। দশ দিনেও মেলা ভাঙত না। কিন্তু সেই দিন আর নেই। তিন দিন পরেই মেলা ভেঙে যায় এখন। খাজনা আদায় হয় খুবই সামান্য।

জাহানজেব ভেবে নেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন,—আচ্ছা, দশ আনা-ছয় আনাই ঠিক। আপনি ছয় আনাই পাইবেন।

—আপনার মেহেরবানী। এইবার নিয়া আসেন। দেরি অইয়া যাইতে আছে।

জাহানজেব ঘরে যান। কিছুক্ষণ পড়ে মোড়লকেও ডেকে নিয়ে যান ঘরে। একটু পরে একটা মোড়ক পকেটে পুরতে পুরতে বেরিয়ে আসেন মোড়ল। বলেন,—আমি একটু ঘুইরা আসি। বেবাক মানুষ আইলে আমারে একটা খবর দিয়েন।

জোহরের নামাজের পর আবার লোকজন এসে জড় হয় হাজী বাড়ি। সাবেদ মোড়লকে খবর দিয়ে আনা হয়। তিনি বলেন,—আগাম পীর সা'বরে আর হাজীবাবার মাজারে রাখতে পারলাম না। একটুও রহম অইল না ওগ দিলে।

সকলের কথাবার্তায় আপসোস ফুটে ওঠে।

মোড়ল আবার বলেন,—কি আর করি! না-হক খুনাখুনি কইর‍্যা দেখছি কোন ফল অইব না। উপরে আল্লা আছে, আল্লায় বিচার করব। তোমরা কয়েকজন শিমুলতলার গোরস্থানে চইল্যা যাও। কবর খোদা শুরু কর গিয়া। আর বিলম্ব কইর‍্যা কোন ফায়দা অইব না।

চার-পাঁচ জন লোক খোন্তা-কোদাল নিয়ে চলে যায়। সাবেদ মোড়ালের নির্দেশে বোম্বাই হাজীর গোছলের বন্দোবস্ত করতে লেগে যায় কয়েকজন।

জানাজা শুরু হয়েছে। কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে লোকজন। কেউ নিয়ত পড়ছে, কেউবা তহিনা বেঁধে ফেলেছে।

ইমামের কণ্ঠে তক্‌বীর উচ্চারিত হয় প্রথমবার, *'আল্লাহু আকবর।'*

এমন সময় কোথা থেকে বহু লোক এসে শামিল হয় জানাজায়। শেষ কাতারের পেছনে আরো আট-দশ কাতার পড়ে যায়।

জানাজার শেষে সবাই বিস্মিত হয় এত লোক সমাগম দেখে। তারা আরো বিস্মিত হয় যখন দেখে, বাদশা সরদার গিয়ে দাঁড়িয়েছেন জাহানজেব মিয়ার সামনে। তাঁর পেছনে একজন অপরিচিত হাজী।

বাদশা সরদার জাহানজেবের হাত ধরে একরকম কেঁদে ফেলেন,—আমারে মাপ কইর‍্যা দিয়েন, মিয়াসাব। কোন দায়-দাবী রাইখেন না আমার উপর। আমি জাহিল মানুষ।

অপরিচিত হাজী সায়েব বলেন,—আহ্-হা, আমি এত দূরদেশ থেইকা আইছিলাম এত আরজু লাইয়া। কিন্তু খোদার এমন মর্জি, হাজী সা'বের সাথে আর দেখা হইল না। এমন পরহেজগার খোদাপাবন্দ লোক ছিলেন হাজী সা'ব!

হাজী সায়েব তাঁর কাঁধের জাফরানী রঙের রুমালে চোখ মোছেন। আবার বলেন তিনি,—তবু আল্লার কাছে হাজার শোকর, তাঁর জানাজায় শরীক করবার জন্যে আইজ আমারে টানতে টানতে লইয়া আইছে এইখানে।

জাহানজেবের সাথে মুসাফা করে হাজী সায়েব বলেন,—আমার বাড়ি মমিনসিং জিলা। হাজীসা'ব আর আমি একই বছর মক্কাশরীফ যাই। এক কমজাত মোয়াল্লেম আমার ট্যাকা-পয়সা লইয়া ভাইগা যায়। তখন এই হাজীসা'ব আমাকে পাঁচ শ' ট্যাকা দেন। এই ট্যাকা না পাইলে আমি আর দেশে ফিরা আসতে পারতাম না। এতদিন ট্যাকা যোগাড় করতে পারি নাই বুইল্লা আইতে পারি নাই। আহ্-হাহা! দুইডা দিন আগেও যদি আইতে পারতাম।

হাজী সায়েব চোখ মুছতে মুছতে জুব্বার জেব থেকে একটা মোড়ক বার করেন। মোড়ক খুলে এক তাড়া নোট জাহানজেবের হাতে দিয়ে বলেন,—যাঁর কাছে দায়িক ছিলাম তাঁর হাতে দিতে পারলাম না। এই আপসোস আমার যাইব না কোন দিন! তবু আল্লার কাছে হাজার শোকর, তাঁর ফরজন্দের কাছে দিয়া যাইতে পারলাম।

বাদশাহ সরদার বলেন,—হাজীসা'ব বিচারাইতে বিচারাইতে হাজীবাবার মাজারে আসছিলেন। আমারে পাইয়া জিগাইলেন,—আবিদ আলী হাজী সা'বের বাড়ি কোন্ দিগে? তখন তাঁর কাছ থিকা এত কথা জানতে পারলাম।

একটু থেমে আবার বলেন সরদার,—হাজীবাবার মাজারে কবর খুঁড়বার বন্দোবস্ত

কইর‍্যা আইছি।

—কিন্তু শিমুলতলায় যে গোর খোদা অইয়া গ্যাছে! সেইডার কি অইব ? সাবেদ মোড়ল বলেন।

—রাইখ্যা দেও ওইডা। ওইডার মধ্যে আমারে কবর দিও।

বিরাট শবযাত্রা চলেছে হাজীবাবার মাজারের দিকে। মুর্দার খাটে আরো কয়েক জনের সাথে কাঁধ লাগিয়েছেন সাবেদ মোড়ল ও বাদশা সরদার।

৩ রাজার দেউড়ি, ঢাকা
৯ ফাল্গুন, ১৩৬০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪

শয়তানের ঝাড়ু

কয়েকজনকে নিরাশ করে অবশেষে যে নাছোড়বান্দার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তার বাক্‌শক্তির প্রশংসা করতে হয়। তার মুখ থেকে আহার-বাসস্থানের যে রকম লোভনীয় ফিরিস্তি বেরুচ্ছিল তাতে যে কোন ভোজনবিলাসী ও নিদ্রাবিলাসীর মজে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের ওসব বিলাসের বালাই নেই। আমাদের যা অবশ্য দরকার তা হচ্ছে তাঁবু ফেলবার জন্যে মাঠমতো একটা জায়গা। খাদেমকে বুঝিয়ে বলতে সে বলে,—হঁ, খুব ভালো জায়গার ব্যবস্থা কইর‍্যা দিমু। এইজন্য চিন্তা করবেন না। খাজনাও খুব কম।

খাদেমের ইশারায় আমাদের লটবহর স্টেশন থেকে একটা ছৈ-বিহীন ডিঙায় উঠে গেছে আগেই। ঐ ডিঙায় দলের লোকজনকে তুলে দিলাম। আমি আর মোতাহার উঠলাম একটা ছৈ-ওলা নৌকায়। খাদেমও উঠে বসল আমাদের সাথে।

নানান কথার পর মোতাহার এক সময়ে খাদেমকে জিজ্ঞেস করে,—আচ্ছা, এ হাজীবাবা কে ছিলেন ?

—তা জানেন না! আপনারা এইবার নতুন আসছেন বুঝি ?

খাদেম ঠিকই ধরেছে। নতুনই এসেছি আমরা। কোন খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধুমাত্র পঞ্জিকা দেখে দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়েছি দল নিয়ে।

বন্ধু আবু মোতাহার প্রখ্যাত যাদুকর। আমি তার সহকারী। দেশে-বিদেশে ঘুরে আমাদের অভ্যাস এমন হয়েছে, ঘর ভালো লাগে না বেশি দিন। যাদুখেলা আমাদের পেশা। কিন্তু ভ্রমণের নেশাই আমাদের নামিয়েছে এ পথে। বাড়িতে বেশি দিন থাকলেই দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় যেন। মাত্র দু'মাস হল জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও বার্মা ঘুরে ঢাকায় ফিরে এসেছি। এরি মধ্যে ভ্রমর-মন উড়ু উড়ু শুরু করে দিয়েছে।

বন্ধুকে বলি,—চল, আবার সাগর পাড়ি দেয়া যাক।

—না, এত শিগগির নয়। ভেবে দেখলাম, আগে নিজের দেশকে চেনা দরকার, দেশবাসীকে জানা দরকার ভালো করে। এতদিন শুধু শহরে শহরে ঘুরেছি। এবার পাড়াগাঁয়ে ঘুরবার ইচ্ছে আছে।

—তা মন্দ হয় না। তুমি ঠিকই বলেছ। গাঁয়ের মাটি আর মানুষের সাথে আমাদের শহরবাসীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি ?

—কোন মেলাটেলা আছে কি এ সময়ে ? ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় মেলার খবর পাবে।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা একটা যোগাড় করে পাতা উল্টিয়ে চললাম।

—হ্যাঁ, পাওয়া গেছে—২০শে মাঘ থেকে শুরু হবে সুরেশ্বরের মেলা।

—সে তো চার-পাঁচ দিন মাত্র বাকি আছে। এত তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেয়া যাবে না।

—ফাল্গুন মাসের পাঁচ আর ছ' তারিখ রামকেলির মেলা।

—উহুঁ, দু' চার দিনের মেলায় গিয়ে খরচ উঠবে না।

—তবে মহামুনির মেলায় যাওয়া যাক। চাটগাঁয়ে মগ-চাকমাদের বিরাট মেলা। চলবেও পনেরো দিন। বোশেখ মাসের পয়লা শুরু।

—সে অনেক দেরি। ফাল্গুন মাসে আর কোন—

—হ্যাঁ আছে, মোহনপুরের মেলা।

—মোহনপুরের মেলা! নামটা যেন শুনেছি কোথাও। যাতায়াতের সুবিধে কি আছে, পড় তো সবটা।

"মোহনপুরে হাজীবাবার মাজার ও দরগা আছে। ইহা কদমতলী স্টীমার স্টেশন হইতেই সাত মাইল দূরে ক্ষীণস্রোতা রজতরশি নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ১৫ হইতে ২৫ তারিখ পর্যন্ত উরস উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা বসে। অনেক দূরদেশ হইতে এই মেলায় বহু ভক্ত, মুরীদ, ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়। পদ্মা সার্ভিসের স্টীমারে কদমতলী ও সেখান হইতে নৌকায় মোহনপুরে যাওয়া যায়।"

পঞ্জিকার এই খবরটুকু মাত্র সম্বল করে আজ কদমতলী স্টেশনে নেমেছি। হাজীবাবার পরিচয় পাব কেমন করে!

খাদেমের মুখে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় :

—হাজীবাবা ছিলেন জবরদস্ত ফকির। ভূত, পেত্নী, মক্কল, ওবা, দেও, দানো-আদমজাতের এই দুশমনগুলো এমন কি জিন-পরীও নাকি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। তাঁর হুকুমের জন্যে ওরা সব এক পায়ে খাড়া থাকত। তাঁর আঙ্গুলের ইশারা পেলে ওরা ছুটে আসত হুকুম তামিল করবার জন্যে। এক শ' কি সোয়া শ' বছর আগে হাজীবাবা গতায়ু হয়েছেন। এখনো তাঁর মাজারে যে যেই নেয়াত, যে মকসেদ নিয়ে যায়, তার সে নেয়াত, সে মকসেদ হাসেল হয়। তাঁর গুণ-কেরামতের আশ্চর্য আশ্চর্য কাহিনী আশি বছরের বুড়োবুড়ী থেকে শুরু করে ন্যাংটো ছেলে-মেয়ে সকলের মুখেই নাকি শুনতে পাওয়া যায়।

আমাদের কৌতূহল চাড়া দিয়ে ওঠে। মোতাহার বলে,—যদি তকলিফ মনে না করেন, তবে মেহেরবানী করে তাঁর কেরামতির দু' একটা কাহিনী—

খাদেম যেন তৈরি হয়েই ছিল। মোতাহারের অনুরোধ শেষ না হতেই সে শুরু করে, —সে আজকালকার কথা না। ছয়-সাত পুরুষ আগের কথা। সেই বছর শয়তানের ঝাড়ু দেখা গেছিল আসমানে।

—শয়তানের ঝাড়ু! সে আবার কি? বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করি।

—লেজওয়ালা তারার কথা শোনছেন?

—হ্যাঁ, শুনেছি।

—নিজের চউখে দেখছেন কোনদিন?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—সেই লেজওয়ালা তারা।

—ও-হ্-হো-হো, ধূমকেতু। মোতাহর বলে।

দু'জনেই হেসে উঠি।

খাদেমের চোখেমুখে বিরক্তির আভাস। রাগত স্বরে সে বলে,—হাসতে লাগছেন ক্যান মিয়ারা ?

—না-না, হাসছিলাম, মানে—মানে আপনার ঐ শয়তানের ঝাড়ু নামটা শুনে।

—শয়তানের ঝাড়ু না-তো কি ? আপনারা দেখছি দীন-দুনিয়ার কোন খোঁজ খবর রাখেন না। আর রাখবেনই বা কেমন কইর‍্যা ? এংরাজী মক্তবের বই-পোস্তকে কি এইসব পাইবেন ? এইসব হইল গিয়া মারফতী কিতাবের কথা।

—শয়তানের ঝাড়ু দেখা গেল আসমানে, তারপর ?

—হুঁ, দিনে দিনে সেই ঝাড়ু বড় হইতে লাগল। সবাই বুঝল, এক মস্ত মুসিবত নজদিগ। এই ঝাড়ুর ঝাঁটায় সারে জাহান ফানা হইয়া যাইব। জিন-ইনসান, পশু-পক্ষী, বিরিক্ষি-লতা স-ব কাইন্দা জারেজার। কত আওলিয়া-দরবেশ কত কিছু করলেন! কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঝাড়ুর আগা বাড়তেই লাগল, বাড়তেই লাগল। তখন হাজীবাবা কেঁচি বাণ মাইর‍্যা ঝাড়ুর আগা কাইট্যা দিয়া কইলেন, *"এইবার দেখব কয়দিন থাকতে পার আর কত বাড়ন বাড়তে পার।"* সত্য সত্যই ঝাড়ু আর বাড়তেই পারল না। কয়েকদিন পরেই শয়তান ঝাড়ু লইয়া ভাইগ্যা গেল। হাজীবাবা বাণ না মারলে ঝাড়ু লম্বা হইত হইতে জমিনে আইস্যা ঠেকত। আর তখন শয়তানের ঝাঁটা-পিটা খাইয়া কি দশা হইত চিন্তা কইর‍্যা দ্যাখেন আপনারা।

—ঠিকই, তামাম দুনিয়া একেবারে ছারখার হয়ে যেত। হাজীবাবা ঝাড়ুর আগা কেটে দিয়েছিলেন বলেই তো আমরা এখনো বেঁচে আছি। মোতাহার বলে।

—তার পরেও তো শয়তানের ঝাড়ু দেখা গেছে কয়েকবার। কিন্তু হাজীবাবার বাণে কাটা পড়েছে বলেই না ওটা এতটুকু দেখা যায়। আমিও মোতাহারের কথার পেছনে লেজ জুড়ে দি।

খাদেম এবার খুশি হয় আমাদের ওপর। বলে,—তাঁর মক্কাশরীফ যাওয়ার বিত্তান্ত শোনেন নাই বোধ হয়! সে আর এক আজব কিচ্ছা।

হাজীবাবার হজ যাত্রার আজব কিচ্ছা শুনলাম—

হাজীবাবা ছিলেন ক্বামেল ফকির। দুনিয়া-জাহানের এলেম-কালাম, তুক-তাক, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি অনেক কিছু হাসেল করেছিলেন তিনি। বাড়ির বৈঠকখানার পাশে কাঠের একটা ছোট কুঠরী ছিল তাঁর হুজ্‌রাখানা। প্রত্যেক চান্দ্রমাসের সাতাশ তারিখে তিনি হুজ্‌রাখানার দরজা-জানালা বন্ধ করে ধ্যান-জিকির করতেন। নতুন চাঁদ উঠলে আবার বেরিয়ে আসতেন। তাঁর এ নির্জনবাসের সময়েও নাকি তাঁর কাছে মিঠাই বিক্রি করেছে পাঁচমাইল দূরের হালুইকর, তাঁকে নদী পার করে দিয়েছে খেয়া নৌকার মাঝি, নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়াতে দেখেছে জেলে-মাঝিরা।

একদিন এক জেলে বড় একটা রুইমাছ নিয়ে হাজীবাবার বাড়িতে আসে। সে বলে, —মাছটা হুজুরের লেইগ্যা আনছি। গতরাত্রে জাল উডাইয়া ওপারে বইস্যা তামুক খাইতে আছি, এমুন সময় দেখি হুজুর উত্তর দিক থিকা আইতে আছেন।

বাড়ির লোকজন বলে,—অ্যাঁ, নদীর ওপারে! ধ্যাৎ, উনি তো তিন দিন থিকা হুজ্‌রাখানায়!

—না তো! আমরা নিজা চউক্ষে দেখছি তারে! আমাগ লগে কথা কইলেন! ডাক দিয়া জিগাইলেন, কি পাইছস ?

আমি কইলাম,—কয়েকটা গুঁড়া-গাড়া পাইছি। তিন-তিন বার গড়ান দিলাম, মোডেই সুবিধা অইতে আছে না।

হুজুরে কইলেন,—আর একটা গড়ান দে, সুবিধা অইব।

—আমরা জাল ফালাইলাম। ঐ গড়ানে পাইলাম দুইডা রুইত আর তিনডা কালিবাউস। পরকাণ্ড পরকাণ্ড এক একটা এইডার মতোন।

শুনে তাজ্জব বনে যায় সবাই। কোন বিশেষ সময়ে হুজুর যখন খিল-আঁটা ঘরে ধ্যানস্থ, তাঁকেই আবার সে সময়ে হালুইকরের দোকানে, নদীর পারে দেখা কেমন করে সম্ভব ?

ফকিরের শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর এ বিস্ময়কর কেরামতির কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দলে দলে লোক মুরীদ হওয়ার জন্যে ছুটে এল দূর-দূরান্তর থেকে।

যে বছর শয়তানের ঝাড়ু উঠেছিল আসমানে, সে বছরের একদিনের কথা। ফকির হুজ্‌রাখানায় 'ছিলায়' বসলেন। জেলহজ মাসের নতুন চাঁদ উঠল। প্রথম চাঁদের দিন তাঁর বেরিয়ে আসার কথা। কিন্তু তিনি বেরুলেন না। তাঁর উদ্বেগ-ব্যাকুল আত্মীয়-পরিজন, সাগরেদ-মুরীদ দিন গুণতে থাকে অধীর প্রতীক্ষায়। এক দিন-দু'দিন করে পাঁচ দিন চলে যায়। ছ' দিনের দিন সাগরেদরা দরজা ভেঙে ঘরে গিয়ে দেখে, ফকির নেই। ঘরে আতরের খোশবু। কেউ বলে, 'ফকির সফরে বাইর অইছেন।' কেউ বলে, 'ফকির ইন্তেকাল ফরমাইছেন। তাঁর লাশ ফেরেশতারা তুইল্যা নিয়া গেছে।'

ফকিরের ভক্ত নয় এমন লোক বলে,—ভূত-পেত্নী লইয়া যারা কারবার করে, তাগ মরণ হয় ঐ ভূত-পেত্নীর হাতে।

শেষের এই চরম সম্ভাবনার নিচে নানা জনের নানা অনুমান চাপা পড়ে যায়। ফকিরের অন্তর্ধানে তাঁর চার বিবি, সাত পুত্র, আঠারো কন্যা শোকে শোকাকুল। সাগরেদ-মুরীদরা সবাই আহা-আহা করে কপাল চাপড়াতে থাকে। শোকের মাত্রা যখন বিলাপ থেকে দীর্ঘশ্বাসে নেমে এসেছে, এমনি এক সন্ধ্যায় সফেদ জুব্বা-ইজের পরে, পাগড়ি মাথায় দিয়ে ফকির বাড়ি এলেন। তিনি হজ করে এসেছেন। সাগরেদ-মুরীদরা খুশির জোশে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

ফকির তাঁর হজ যাত্রার কাহিনী বলেন :

—জেলহজ মাসের নতুন চাঁদ উঠেছে। মাগরেবের নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসবেন, এমন সময় হুজ্‌রাখানা খোশবুতে ভরে গেল। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই চেয়ে

দেখেন, তাঁর সামনে একজন অপূর্ব সুন্দর পুরুষ। তাঁর নূরানি চেহারায় অন্ধকার হুজ্‌রাখানা ফরসা হয়ে গেল। আগন্তুক তাঁর সাথে মুসাফা করে বললেন,—আমি জিন জাতির বাদশাহ। চৌথা আসমানে আপনার নিশান দেখে প্রথম জানতে পারি, আপনি ইনসানদের মধ্যে সবচেয়ে ক্বামেল পীর। সেই থেকে আপনার সাথে মোলাকাত করার খুব ইচ্ছা। তারপর যেদিন জানতে পারলাম আপনিই বাণ মেরে শয়তানের ঝাড়ু বিনাশ করেছেন, সেইদিনই আপনাকে আমার পীর বলে গ্রহণ করেছি। আমার উজির-নাজির, সেপাই-লস্কর সব মক্কাশরীফ হজ করতে গেছে। আমাদের সকলেই খুব খাহেশ, আপনার সাথে হজ করে অসীম সওয়াব হাসেল করি। আর হজের পর পাক দিলে আপনার মুরীদ হই। তারপর দু'জনে পিঁপড়ে হয়ে হুজ্‌রাখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। জিন-সম্রাট কাঁধ এগিয়ে দিয়ে বললেন,—আমার কাঁধে সওয়ার হয়ে চুল ধরে শক্ত হয়ে বসুন। দেখুন, কেমন জোরে উড়ে চলে যাই আপনাকে নিয়ে। ফকির বললেন, 'না, না, তা কি করে হয় ? তা ছাড়া কাঁধের ফেরেশতা কেরামন ও কাতেবীন নারাজ হবে যে!' আসমানে একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে যাচ্ছিল তখন। ফকির হাতের ইশারায় মেঘটাকে ডাকলেন। মেঘ নেমে এল। মেঘে সওয়ার হয়ে তিন দিন-তিন রাত্রি আকাশ চারণের পর তাঁরা মক্কাশরীফ হাজির হন। সেখান থেকে হজ সেরে কুফা, কারবালা, বোগদাদ এবং সব শেষে জিনপরীর দেশ কোহ্‌কাফ সফর করে মেঘে চড়ে আবার ফিরে আসেন।

হাজীবাবার কাহিনী শেষ করে আমাদের মুখের দিকে তাকায় খাদেম। তারপর আবার বলে,—জানেন, এখনো জিন-পরীরা বাবার মাজার জিয়ারত করতে আসে!

—আপনি দেখেছেন ? মোতাহার জিজ্ঞেস করে।

—আমাগ মতন গুনাগার মানুষে কি তাগ দেখতে পায় ? তবে মাঝে মইদ্যে নিশুত রাইতে কোরান শরীফের আয়াত পড়তে শোন্‌ছে অনেকে। আমিও একদিন শুনেছি। কি উচ্চারণ কি মিঠা এলাহান!

মোহনপুরের ঘাটে যখন নৌকা ভিড়ে তখন সন্ধ্যার অনেক দেরি। দলের লোকজন ও লটবহর নৌকায় রেখে খাদেমের সাথে দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ি।

মেলার দু'দিন আগে এসেছি, তবুও মনে হল, আমরাই সকলের শেষে এসেছি। দুটো সার্কাস দল তাঁবু ফেলে গোছগাছ হয়ে বসেছে। ঘোড়া-চক্কর, রাধা-চক্কর, পুতুল-নাচ, ভালুক-নাচ, আরো কত কি এসেছে! চট ও হোগলার ছাউনি তৈরি করতে লেগে গেছে দোকানীরা। কেউ কেউ এরই মধ্যে ছাউনির নিচে পণ্য সাজিয়ে বসে গেছে। কেউ বা ঝগড়া করছে জায়গার দখল নিয়ে।

আমাদের তাঁবু ফেলবার জন্যে মেলার থেকে অল্প কিছু দূরে মাঠমত একটা জায়গা পেয়ে যা হোক নিশ্চিন্ত হলাম। গাছ পালা, ঝোপ-ঝাড়ের সবুজ সমারোহ দেখতে দেখতে, পাখ-পাখালীর কল-কাকলি শুনতে শুনতে অলস পদক্ষেপে গেঁয়ো পথ ধরে চলছি আমরা। হাজীবাবার মাজারের কাছাকাছি আসতেই খাদেম বলে,—ঐ যে বাবার মাজার।

গম্বুজ দূর থেকেই দেখেছিলাম, এবার হাজীবাবার সমাধি-সৌধ দেখলাম। মাজারের বাইরে বাঁধান চত্বর লোকে লোকারণ্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক সব। ভিখারীও

এসে জুটেছে সব রকমের—কানা, খোঁড়া, বোবা, লুলা। এক জায়গায় লম্বা লাইন লেগেছে।

—কি ব্যাপার ?

খাদেম বলে,—পীর সা'বের দোয়ার জন্যে জমায়েত হইছে। হাজীবাবার আওলাদ-তাঁর নাতির নাতির ছেলে হজরত জাহানজেব আলী এখন গদিনশীন পীর। উরসের কয়েক দিন আছরের নামাজের পর উনি মাজার শরীফে তশ্‌রীফ নেন।

একটু থেমে সে আবার বলে,—জানেন, আমাগ এই হুজুরের তাঁবেও আছে হাজার হাজার জিন। ঐ জিন কারা কইতে পারেন ?

—না তো! মোতাহার বলে।

—ঐ যে জিনের বাদশার কথা কইছিলাম, তাঁর আর তাঁর সেপাই-লস্করদের আওলাদ। হুজুর যদি হুকুম করেন, ঐ সকল জিন একদিনের মইদ্যে সারে জাহান ফতে কইর‍্যা হুজুরকে তামাম দুনিয়ার বাদশা বানাইয়া দিতে পারে। কিন্তু আমাগ হুজুর বাদশা হইতে চান না।

—কেন ?

—তিনি তো ফকির মানুষ, পীর। বাদশাই লালচ তাঁর নাই।

—তিনি বাদশা হইতে না চান, খুবই ভালো কথা। মোতাহার বলে।—কিন্তু মুসলমানদের একটা উপকার তো করতে পারেন।

—কি উপকার ?

—ফিলিস্তিনের মুসলমানরা বড় সাংঘাতিক মুসিবতে আছে। ইহুদীরা তাদের ওপর বেধড়ক জুলুম করতে আছে। হুজুর যদি তাঁর তাঁবের সব জিন ইসরাইলে চালান দিয়া ইহুদীদের বেবাক সেপাই-লস্কর মিসমার কইরা দিতে পারতেন, ইহুদীদের তামাম যুদ্ধের সরঞ্জাম ধ্বংস—

—কোন মুল্লুকের কথা কইলেন ? মোতাহারের কথা শেষ না হতেই জিজ্ঞেস করে খাদেম।

বুঝলাম, জিনের মুল্লুক ছড়া খাদেম আর কোন মুল্লুকের খবর রাখে না। তাই প্রসঙ্গ এড়িয়ে পীর সায়েবকে দেখবার অভিলাষ জানালাম। খাদেম এক কোণের দিকে নিয়ে গেল আমাদের।

জানালা দিয়ে দেখলাম—ফরাসের ওপর তাকিয়া হেলান দিয়ে মধ্য-বয়সী পীর সায়েব বসে আছেন। দু'পাশ থেকে দু'জন লোক পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছে তাঁকে। এক পাশ একটা সবুজ চাদরের ওপর নোট আর কাঁচা টাকার স্তূপ জমেছে।

—পীর সায়েবের দোয়া পেতে হলে নজরানা দিতে হয় বুঝি ? আমি জিজ্ঞেস করি।

খাদেম বলে,—সবাই দেয়, যার যা মনে লয়। কোন জোর-জুলুম নাই। তবে হুজুর সবার টাকা পর্শ করেন না। যার টাকার উপর হুজুরের হাত পড়ে তার খোশ নসীব। এই দুনিয়ায় তার আর বালা-মুসিবত আসব না কোনদিন।

দোয়াপ্রার্থীরা পীর সায়েবের সামনে নজরানা রেখে তার কদমবুসি করছে। আর পীর সায়েব তাঁর তসবী ছড়া তাদের মাথায় ঠেকিয়ে দোয়া করছেন। একজন পাঙ্খা-বরদার নজরানার টাকা সরিয়ে রাখছে সবুজ চাদরের ওপর।

মোতাহার বলে,—আচ্ছা চলি এখন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

দুই চোখ কপালে তুলে খাদেম বলে,—সে কি! হুজুরের দোয়া নিবেন না ?

—আজ থাক।

—কেন ? এই জুম্মাবারের মতো দিনে—

—আগামী জুম্মা বার তো পাব। আমি বলি।

—কি যে বলেন! আগামী জুম্মা বার কে পায় না পায়, কেহ কইতে পারে ? কিতাবে কয়, মওত সকলের চুলের ঝুঁটিতে বান্দা।

অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও এবার আর নাছোড়বান্দার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম না।

আমাদের ম্যাজিক খেলা চলছে। ঘন ঘন হাততালি আর হাসির হুল্লোড় শুনে বোঝা যায় খেলা খুব জমেছে।

—'অদৃশ্য বল, একই কেটলীতে চা-দুধ-শরবত ইত্যাদি খেলা দেখে আমাদের দর্শকেরা হাততালি দিচ্ছে, আবার 'জিভ কর্তন', 'কঙ্কাল নর্তন'ও 'সাপ ভক্ষণ' দেখে শিউরে উঠছে। একদিকে 'ডিম থেকে পাখি', 'টাকা প্রসব', 'কারেন্সী নোট তৈরি' ইত্যাদি খেলা দেখে তারা হেসে লুটোপুটি, অন্যদিকে 'থট রিডিং', 'শূন্যে ভাসমান মানুষ'-এর খেলা দেখে বিস্ময়ে হতবাক।

এবার 'ইলিউশন বক্স'-এর খেলা। খেলাটা বিনে পয়সায় দেখান হবে। যাদুকরের নির্দেশে কিছুক্ষণ আগে মেলায় ঢেঁড়া পিটিয়ে দেয়া হয়েছে। বিনে পয়সায় খেলা দেখবার জন্যে মেলা ভেঙে ছুটে এসেছে বহুলোক। তাঁবুর সুমুখের ঘের তুলে দিয়ে জায়গার ব্যবস্থা করলাম।

মঞ্চের পর্দা উন্মোচনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে দর্শক। হঠাৎ গায়েবী আওয়াজের মতো আমার নেপথ্য ভাষণ শুরু হয় :

—আপনারা এতক্ষণ ধরে যা কিছু দেখেছেন, তাকে ভোজবাজি বা যাদু খেলা বলে ভুল করবেন না। এ হচ্ছে কেরামত। যিনি আপনাদেরকে এ সব কেরামতি দেখালেন, তিনি একজন জবরদস্ত এলেমদার আদমি। তিনি হজরত শাহ্ বেলাল শাহ্-এর গায়েবী মুরীদ। শাহ্ বেলালের কেরামতির কথা আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। ইনসানের দুশমন শয়তান। এই ইনসানকে ধ্বংস করার জন্যে সে কত রকম কারসাজি করেছে এবং এখনো করছে। আপনারা জানেন, একবার শয়তান আসমান থেকে ইনসানের গায়ে ঝাড়ু মারবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাজীবাবা বাণ মেরে ঝাড়ুর আগা কেটে গিয়েছিলেন। তারও দেড় শ' বছর আগে শয়তান আদম জাতকে ধ্বংস করবার জন্যে তীর-ধনু নিয়ে আসমানে বসেছিল। কিন্তু শাহ্ বেলাল শাহ্ অগ্নিবাণ মেরে শয়তানের সমস্ত তীর পুড়ে ছাই করে দিয়েছিলেন। শয়তানের সেবারের কারসাজি এভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। এখনো মাঝে মাঝে আসমানে শয়তানের ধনু দেখা যায়। অগ্নিবাণে পুড়ে গিয়ে কেমন রঙ হয়েছে ধনুটার, আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন। কিন্তু তীর ছাড়া শুধু ধনু নিয়ে শয়তান এখন আদম জাতের কোন ক্ষতি করতে পারে না। সে যাক, এবার শাহ্ বেলাল শাহ্র সুযোগ্য মুরীদের আর একখানা কেরামতি দেখতে পাবেন।

ঢং-ং-ং-ং

পর্দা সরে গেল। মঞ্চের ওপর বেশ বড় একটা কাঠের সিন্দুকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে যাদুকর। তার পরিধানে পাজামা-পাঞ্জাবী, মাথায় কিশ্‌তি টুপি।

সমবেত দর্শকদের অভিবাদন করে মুখে হাসি টেনে সে শুরু করে,—এই যে বাক্সটা দেখছেন, এটা আমার হুজ্‌রা। এটার ভিতর বসে আমি ধ্যান-জিকির করি।

হাসির গুঞ্জন ওঠে দর্শকদের মধ্যে।

—এটা একটা সাধারণ বাক্স। নিতান্তই সাধারণ। এর ভিতর সাপ, ব্যাঙ, ঘোড়ার আড্ডা কিছু নেই। আমি আশা করি, বাক্সটা খুলে দেখবার আর দরকার হবে না। অযথা সময় নষ্ট না করে এবার আরম্ভ করা যাক। অ্যাঁ, কি বলছেন ? বাক্সটা খুলে দেখাতে হবে ? কেন ? সন্দেহ হচ্ছে ? সন্দেহ! সন্দেহ ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ভালো নয়। আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, সন্দেহই হচ্ছে খাঁটি সত্যে পৌঁছবার সিঁড়ি। কিন্তু ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। আপনারা জানেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। অতি খাঁটি কথা। সুতরাং বিশ্বাস করুন, এটা একটা সাধারণ বাক্স। এর মধ্যে কিছু নেই, কোন কারিকুরি নেই। অ্যাঁ, কি বলছেন ? খুলে দেখতে চান ? আচ্ছা আসুন।

দর্শকদের ভিতর থেকে কয়েকজন লোক মঞ্চে উঠে আসে।

যাদুকর বলে,—সন্দেহ যখন হয়েছে তখন ভালো করে তল্লাশ করে দেখুন বাক্সটা।

বাক্সটা খুলে হাতড়ে, উল্টিয়ে, বন্ধ করে পরীক্ষা করে দেখে তারা।

—কেমন, সন্দেহ ঘুচল ? কোন কারিকুরি নেই তো বাক্সে ?

তারা সমস্বরে বলে,—না।

একটা বস্তা, হ্যান্ডকাফ, সীল ও গালা নিয়ে আমি মঞ্চে প্রবেশ করি। যাদুকর আমার হাত থেকে হ্যান্ডকাফটা নিয়ে সবাইকে দেখায়। তারপর একজন দর্শকের হাতে হ্যান্ডকাফটা লাগিয়ে প্রমাণ করে, পুলিশের হ্যান্ডকাফ আর এটার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

মঞ্চে আহূত দর্শকেরা যাদুকরের দু'হাতে হাতকড়া লাগিয়ে তাকে বস্তার ভিতর পুরে, বস্তার মুখ বেঁধে, নিজেদের হাতে গালা দিয়ে সীল করে দেয়। বস্তাবন্দী যাদুকরকে এবার বাক্সে পুরে তালা লাগিয়ে দেয় একজোড়া।

রাজনা বেজে ওঠে।

আমি ও আর একজন সহকারী একটা কালো মশারি বাক্সের ওপর দোলাতে থাকি। মিনিট দু'-তিন পরে হাতের ইশারায় বাজনা থামিয়ে ডাকি,—হুজুর, আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে কি ?

বাক্সের ভেতর থেকে অস্পষ্ট উত্তর শুনে দর্শকদের কাছে নিবেদন করি,—হুজুর বলছেন, আপনারা তাঁকে যেভাবে বন্দী করেছেন তাতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছে।

আবার বাজনা শুরু হয়।

পাঁচ মিনিট পরে বাজনা থামিয়ে আবার ডাকি,—হুজুর! এবার বাক্স খুলে দেব ? আপনি কি বাইরে আসবেন ?

কোন সাড়া নেই। দর্শকদের সম্বোধন করে বললাম,—ভাইসব, হুজ্‌রায় হুজুরের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে তাঁবুর সর্বত্র। কি হয়-না-হয় দেখবার জন্যে সব দর্শক উন্মুখ আগ্রহে চেয়ে আছে কালো মশারির দিকে। মশারির নিচেই রয়েছে বাক্সটা।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ কার উচ্চকণ্ঠ ধ্বনিতে হয়, *'আস্‌সালামু আলায়কুম।'*

দর্শকবৃন্দ পেছন দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে কোলাহল করে ওঠে। যাদুকর সকলের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পরিধানে সাদা জুব্বা-ইজের, মাথায় আরব দেশীয় পাগড়ি।

মঞ্চের ওপর থেকে যাদুকর গম্ভীর স্বরে বলে,—এখন যে কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করব, তা শুনে অনেকেই হয়ত বলবেন, গাঁজার কল্কেতে ক'টা খিচ টান দিয়ে এসেছি। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, চোখে বিশ্বাসের সুরমা লাগিয়ে নিন। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, আমি আরব মুল্লুক থেকে এইমাত্র ফিরে এসেছি। পিঁপড়ে হয়ে হুজ্‌রার ভিতর থেকে বেরিয়ে দেখি—জিন-সম্রাটের সেনাপতি হাওয়াই পাল্কি নিয়ে হাজির। সেই উড়ো পাল্কিতে চড়ে বসলাম। চোখের পলক পড়তে না পড়তে আরব মুল্লুকে পৌঁছে গেলাম। সেই মুল্লুকের এক বেদুইনের তাঁবুতে দাওয়াত খেয়ে এইমাত্র ফিরে এসেছি। বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে বেদুইন দোস্তকে দিয়ে এসেছি আমার পাজামা-পাঞ্জাবি ও কিশতি টুপি আর আমি নিয়ে এসেছি তাঁর এই জুব্বা-ইজের আর মাথার তাজ।

যাদুকর আবার শুরু করে,—কি, আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না ? তবে এই তাজ, জুব্বা, ইজের পরে আমি কোত্থেকে এলাম ? আপনারা বলুন, বোম্বাই থেকে ফিরে এসেছি ? না-না, আমি সে রকম বোম্বেটে নই। .....অ্যাঁ, কি বলছেন ? জোরে বলুন। ..... অ্যাঁ, বোম্বাইও যাইনি! আমি অত্যন্ত দুঃখিত। বিশ্বাস না করলে বিশ্বাসের বোঝা চাপিয়ে দেয়া যায় না। আরো প্রমাণ হাজির করলে নিশ্চয় আপনাদের সন্দেহ দূর হবে।

আবার বাজনা বেজে ওঠে। যাদুকর কালো মশারির নিচে অন্তর্হিত হন।

কিছুক্ষণ পরে মশারি সরিয়ে ফেলি। দর্শকদের কয়েকজন আমার আহ্বানে মঞ্চে উঠে আসে। তারা বাক্সের তালা খুলে, ডালা উঁচিয়ে দেখে—যাদুকর রয়েছে বস্তার মধ্যে। সীল রয়েছে ঠিক যেমন ছিল। বস্তা খুলে বের করা হয় যাদুকরকে। তার হাতে হাতকড়া, পরিধানে সেই জুব্বা-ইজের, মাথায় আরব দেশীয় তাজ।

দর্শকদের একজন তার হাতকড়া খুলে দেয়।

যাদুকর তার জুব্বার পকেটে হাত দিয়ে বের করে একটা ঠোঙা আর একটা শিশি। সে বলে,—এই ঠোঙার মধ্যে আছে আরব মুল্লুকের খোরমা। আর এই যে শিশিটা দেখছেন, এর মধ্যে রয়েছে উটের পছিনা—উটের ঘাম। এর এক ফোঁটা ঘরে রাখলে ভূত-পেত্নী, ব্যারাম-আজার-কিচ্ছু আসতে পারবে না। এগুলো বেদুইন বন্ধুর তাঁবু থেকে নিয়ে এসেছি। আশা করি এবার আর অবিশ্বাস করবেন না। এখন তবে বিদায় হই। দোয়া করবেন। আস্‌সালামু আলায়কুম।

হতভম্ব দর্শকবৃন্দ হাঁ করে চেয়ে আছে।

যাদুকরের বাঁ হাতের সঙ্কেতে যবনিকা টেনে দিই।

৩ রাজার দেউড়ি, ঢাকা
২০ ফাল্গুন, ১৩৬০ মার্চ, ১৯৫৪

হারেম

হারেমের ব্যাপার। বাইরে জানাজানি হলে বিপন্ন হবে মান-সম্ভ্রম। তাই আমীর নিজেই তদন্তে বেরিয়েছিলেন।

তদন্ত শেষ করে আমীর মুরাদ বেন-হাম্মাদ আল্-জুলফিকার শিশমহলে এসে দোদুল-কেদারায় বসেছেন। চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন চোখে-মুখে থমথমে ভাব। তিনি ডান পা-টা সামনের তুলতুলে চরণচৌকির ওপর তুলে দেন। সুন্দরী এক বাঁদী ছুটে এসে পা-টা কোলের ওপর নিয়ে টিপতে শুরু করে। আমীর মাথা হেলিয়ে দেন কেদারার গায়ে। ভাবনা-ভারাক্রান্ত মাথা চুলকাতে শুরু করলে আর এক বাঁদী এসে মাথায় হাত বুলাতে লেগে যায়।

—পানি। আমীর হাঁক দেন।

আমীরের মুখের পানি শব্দের অর্থ কি, জানে হারেমের সব বাঁদীই। পানীয়ের ট্রলি সাজানই থাকে। এক বাঁদী সেটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে।

—ম্যাডিরা।

—আমীরের মুখে মেহেরবানি হয়েছে আজ। এ মেহেরবানি সব সময়ে হয় না। তখন বাঁদীদের হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। স্থান, কাল আর আমীরের মেজাজ বুঝে পানীয় পরিবেশন করতে হয় তাদের। একটু এদিক-ওদিক হলে শুনতে হয় কলেজে-কাঁপা ধমক। আর যদি ডাহা ভুল করে বসে কেউ, তবে তার রক্ষে নেই। শিশমহল থেকে বদলি করে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে বেওয়ামহলে অথবা খারিজামহলের বিষাদপুরীতে।

সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে আমীরের হারেম। মাঝখানে শিশমহল। তার চারদিকে চার বেগমমহল। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আমীর শরা-শরীয়ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। একই সময়ে চারের অধিক বেগম তিনি রাখেন না। সন্তানবতী বা সন্তানসম্ভবা নারীর দেহ স্পর্শ করা আমীরের পারিবারিক আইনে নিষিদ্ধ। তাই কোন বেগম অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সাথে সাথে বর্জিতা হন। বেগমমহল ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয় খারিজামহলে। সেখানে তাঁর জন্যে মাসিক খোরপোশের বরাদ্দ হয়। শূন্য বেগমমহলে আসেন নতুন বেগম।

বেগমমহলের চারদিকে অনতিউচ্চ দেয়াল। এ দেয়ালের পেছনে সারি সারি কোঠা বাড়ি। এ বাড়িগুলোর সমষ্টিগত নাম খারিজামহল। খারিজামহলে থাকেন আমীরের পরিত্যক্তা বেগমগণ। এ মহলের বাড়ির সংখ্যা দেড় শ'। কিন্তু তার মধ্যে এখনো বাহাত্তরটি খালি পড়ে আছে।

খারিজা মহলের পেছনে হারেমের প্রধান প্রাচীর ঘেঁষে আছে আরো কতগুলো বাড়ি। এগুলোর মিলিত নাম বেওয়ামহল। বর্তমান আমীরের ওয়ালেদ মরহুম আমীর হাম্মাদ বেন-জাফর আল-বাবরের উত্তরজীবিনী ছাপ্পান্ন জন বেগম বাস করেন এ মহলে।

খারিজামহল থেকে দু'জন আর বেওয়ামহল থেকে একজন বেগম উধাও হয়েছেন। খবর পেয়ে আমীর নিজেই গোপন তদন্তে গিয়েছিলেন। তদন্তে আরো জানা গেছে, তিন জন নপুংসক প্রহরীও হারেম থেকে পালিয়েছে। আমীর বুঝতে পারেন, মোটা বখশীশের লোভেই এরা পথ-প্রদর্শক হিসেবে বেগমদের সঙ্গ নিয়েছে।

ভরা পানপাত্র নিয়ে আসে বাঁদী। আমীরের সামনে সে হাঁটু গেড়ে বসে গালিচার ওপর, পাত্রটা এগিয়ে ধরে তাঁর ঠোঁটের সামনে। আমীর চুমুক দিয়ে দিয়ে পাত্র শেষ করেন।

বাঁদী পাত্রে পানীয় ঢালবার জন্যে উঠে যায়। আমীরের মনে চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে মরে—হারেম থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওরা করবে কি? আবার শাদী করবে? তওবা! তওবা! একদা যারা আমীরের শয্যাসঙ্গিনী ছিল, তারা যাবে আ'ম লোকের শয্যাসঙ্গিনী হতে!

আমীরের সমস্ত শরীর রাগে কাঁপতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়ান। পাশের ঘরে গিয়ে বের করেন কয়েক খণ্ড ফটো-অ্যালবাম। এক টুকরো কাগজে টোকা নাম-পরিচিতির সাথে মিলিয়ে তিনি পলাতকা বেগমদের ফটো যোগাড় করেন। এবার একখণ্ড কাগজ টেনে নিয়ে তিনি লিখতে শুরু করেন, 'খারিজামহলের দু'জন ও বেওয়ামহলের একজন বেগম পালিয়ে গেছে।' কিন্তু কি মনে করে কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন। আর একখানা কাগজ টেনে নিয়ে আবার লেখেন, 'হারেমের তিন জন বাঁদী পালিয়ে গেছে। তাদের ফটো এই সাথে দেয়া গেল। যেখান থেকেই হোক এদের ধরে হাজির করতে হবে। বাঁদীদের সাথে তিনজন হিজড়ে গোলামও রয়েছে।' চিঠিটা ও তিনখানা ফটো লেফাফার মধ্যে ভরে সীল করিয়ে তিনি ওটা পাঠিয়ে দেন গোয়েন্দা প্রধানের কাছে।

আমীর আবার এসে দোদুল-কেদারায় গা এলিয়ে দেন। পাঁচ গেলাস পানীয় শেষ করেন পর পর। কিন্তু তবুও এ লজ্জাকর ব্যাপারটাকে তিনি মন থেকে আদৌ দূর করতে পারেন না।

এক সময়ে তিনি ভাবেন—কিছুদিন আগে বেগমদের খোরপোশ অর্ধেক করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। হারেম থেকে পালিয়ে যাবার এটাই কারণ নয় তো?

সাগরের উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র দিস্তান রাজ্য। আয়ের শতকরা নব্বই ভাগ ম্যাঙ্গানীজ খনি থেকে আসত। ব্রিটিশ কোম্পানি এ খনিজ পদার্থটির 'রয়েলিটি' বাবদ বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড তুলে দিত খাজাঞ্চীখানায়। সম্প্রতি দুটো খনি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফলে আয় এখন পঞ্চাশ লক্ষ থেকে তিরিশ লক্ষ পাউন্ডে নেমে এসেছে। আয় কমে যাওয়ার সাথে সাথে ব্যয় সঙ্কোচ করতে হয়েছে অনেক ব্যাপারে। বেগমদের খোরপোশও তাই অর্ধেক করার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি।

আমীরের মনের কুণ্ডলায়িত চিন্তা এবার সরীসৃপের মতো এগোতে শুরু করে। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন,—হ্যাঁ, এটাই কারণ। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

আমীর উঠে দাঁড়ান। টলতে টলতে চলে যান লিফটের দিকে। কর্তব্যরত লিফটচালক কুর্নিশ করে এক পাশে দাঁড়ায়। আমীর লিফটে চড়ে ছাদে গিয়ে নামেন। সেখানে বিদ্যুৎ-চালিত দড়া-কেদারা প্রস্তুতই ছিল। তিনি ঝুলন্ত দড়া-কেদারায় চড়ে বসেন। দড়াপথ বেয়ে উঁচু দেয়ালের ওপর দিয়ে সেটা চলে যায় শাহী দরবারে।

পরামর্শ কক্ষে গিয়ে বসেন আমীর। জরুরী তলব পাঠান উজীরকে।

আমীরের সামনের টেবিলের ওপর কতগুলো বিদেশি সচিত্র সাময়িকী। ছবি দেখে খবর পড়তে তিনি পছন্দ করেন। তাই এ সব বিদেশি পত্র-পত্রিকা তাঁর টেবিলে সাজানই থাকে। একটা টেনে নিয়ে তিনি ছবি দেখতে শুরু করেন।

কারুকার্যখচিত সোনার ট্রেতে করে কতগুলো ভিজিটিং কার্ড এনে সামনে রাখে হুকুমবরদার। আড়চোখে তাকিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করেন আমীর। ওপর থেকে একখানা তুলে নিয়ে দেখেন—আমিরজাদা জোয়াদ বেন মুরাদ।

আমীর মনে মনে বলেন,—আমিরজাদা তো বুঝলাম, কিন্তু কোন বেগমের বুঝব কেমন করে? যত সব জঞ্জাল!

তাঁর চোখে মুখে বিরক্তির আভাস। গম্ভীর স্বরে বলেন,—*নিশান-ই-ফরজন্দ্।*

জন্ম-বিবরণ খোদিত সোনার চাকতি—তারই নাম নিশান-ই-ফরজন্দ্। আমীরজাদারা বাঁ হাতের বাজুতে এবং আমীরজাদীরা কণ্ঠে ধারণ করে এ নিশান। যারা বাঁদীর গর্ভজাত তারা পরে রূপোর তৈরি নিশান।

নিশান আনবার জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছিল হুকুমবরদার। আমীর কি ভেবে বাধা দিয়ে বলেন,—থাক, দরকার নেই। মুনশীকে পয়দায়েশনামা নিয়ে আসতে বলো।

খাসমুনশী পয়দায়েশনামা নিয়ে ছুটে আসে।

ভিজিটিং কার্ডটা খাসমুনশীর দিকে ঠেলে দেন আমীর।

খাসমুনশী পয়দায়েশনামা খুলে বর্ণানুক্রমিক সূচী খুঁজতে থাকে, কিন্তু ঐ নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। আমীর বুঝতে পারেন—জোয়াদ নিশ্চয়ই কোন বাঁদীর ঘরের।

আমীর রেগে ওঠেন। ঠোঁট কামড়ে অস্ফুট স্বরে বলেন,—হুঁ হ্! বাঁদীর বাচ্চা আমীরজাদা ফুটিয়েছে! হারামজাদার আস্পর্ধা কত!

তাঁর ইচ্ছে হয় ছোকরাকে ডেকে হুঁশিয়ার করে দেন। কিন্তু বাঁদীর বাচ্চার মুখদর্শন অশুভ ভেবে তিনি নিরস্ত হন।

কলমদানি থেকে কলম টেনে নেন আমীর। নামের আগের আমীরজাদা কেটে কার্ডখানা ফেরত পাঠিয়ে দেন—এখন দেখা করবার সময় নেই।

উজীর আসেন। বেগমদের খোরপোশের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলে দু'জনের মধ্যে। তাঁদের খোরপোশ পুরো করতে হলে বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ খুনার দরকার। দিস্তানি মুদ্রা দশ খুনা এক পাউন্ডের সমান।

আমীর জিজ্ঞেস করেন,—আর কোথাও কোন খনি বেরুবার সম্ভাবনা নেই?

—কোন সম্ভাবনা নেই জাহাঁপনা। ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা চষে দেখেছে সারারাজ্য।

—তবে উপায় ?

—উপায় একটা আছে জাহাঁপনা। সেচ বিভাগটা—

—ঠিক, ঠিক! এই তো পাওয়া গেছে। সেচ বিভাগটা তুলে দিন। ওসবের দরকার নেই আর। মরুভূমি বানিয়েছেন আল্লাহ্ পাক। আল্লাহ পাক যা কিছু করেন ভালোর জন্যেই করেন। তাঁর মর্জির খেলাপ হলে তিনি বেশখ নারাজ হবেন।

—আলবৎ, জাহাঁপনা! আল্লার মর্জির খেলাপ এসব সেচ-ফেচ করে গুনাহ্গার হওয়া উচিত নয় আমাদের।

—এই তো ঠিক বুঝেছেন।

—কিন্তু জাহাঁপনা, সেচ বিভাগটা তুলে দিলে মাত্র পনেরো লক্ষ খুনা বাঁচবে। বাকি দশ লক্ষ ?

—ইয়ে করুন। কি করতে বলব! হ্যাঁ—হ্যাঁ—, ট্যাকস্ বসিয়ে দিন।

—ট্যাক্স বসাবার আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না, জাহাঁপনা। সেচ বিভাগের জন্যে মাথা পিছু তিন খুনা করে ট্যাক্স বসানো হয়েছে। এর পরে—

—ভেবে দেখুন, পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

উজীর চিন্তার মধ্যে ডুবে যান।

আমীর 'চিত্রে বিশ্ব-বার্তা'খানার পাতা উল্টিয়ে ছবি দেখতে থাকেন।

উজীরের চিন্তায় বাধা দিয়ে আমীর এক সময়ে বলেন,—দেখুন উজীর সায়েব, নাছারাদের আহাম্মকীর নমুনা দেখুন।

সাময়িকীটা তিনি উজীরের দিকে ঠেলে দেন।

উজীর দেখেন—তুলির যাদুকর মিকায়েল অঙ্কিত জগদ্বিখ্যাত তৈলচিত্র 'জুলিয়েত' এর প্রতিলিপি।

আমীর হেসে বলেন,—মেয়েমানুষের এ ছবিটা এক ইংরেজ নাছারা কিনেছে চল্লিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আরে চল্লিশ হাজার পাউন্ডে মেয়েমানুষের ছবি কেন ? দশ দেশের দশটা জীবন্ত মেয়েমানুষ পাওয়া যায়। অ্যাঁ, কি বলেন ?

—আলবৎ, জাহাঁপনা। ওরা একটার বেশি শাদী করতে পারে না কিনা, তাই। এ এক ধরণের 'পারভারশান'—বিকৃতি।

—সত্যি, এ এক অদ্ভুত রকমের বিকৃতি। একটু থেমে তিনি বলেন,—কই, পেলেন কোন্ পথ ?

—পথ একটা পেয়েছি, জাহাঁপনা। এবার খেজুর গাছে ওপর ট্যাক্স বসান যেতে পারে।

আমীরের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

তিনি হাত নেড়ে বলেন,—ঠিক, ঠিক। আপনি ঠিক পথ পেয়েছেন।

—কিন্তু জাহাঁপনা, ট্যাক্স আদায় করা বড় মুশকিল হবে। ওরা অত্যন্ত গরীব।

—হ্যাঁ, গরীব তো ঠিকই। গরীব বানিয়েছে খোদাওন্দ করিম। মানুষে তার কি করবে ? গরীব বলে কি মালিকের খাজনা দিতে হবে না ?

একটু থেমে আবার বলেন,—আপনি ঐ করুন। রাজ্যের তামাম খেজুর গাছ শুমারের জন্যে লোক লাগিয়ে দিন।

পলাতকা তিন বেগমের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেছে তিন মাস খোঁজাখুঁজির পর। তাঁর সহগামী হিজড়ে প্রহরীটাও ধরা পড়েছে।

আমীর শিশমহলে আসেন। এসেই তিনি হিজড়ে প্রহরীদের সর্দারকে তলব করেন। মেয়েলি পোশাক পরিহিত সর্দার দিলবাহার আসে। কুর্নিশ করে দাঁড়ায় আমীরের সামনে।

—আসামী! বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দেন আমীর।

—হাজির করব, জাহাঁপনা ?

—আলবৎ! হ্যাঁ, কি যেন নাম বেগমের ?

—বেগম গুলফাম।

—নিয়ে এস।

সর্দার দিলবাহার কোমর দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে। তার পেছনে বেগম গুলফাম। শঙ্কিত পদক্ষেপে সে সর্দারকে অনুসরণ করছে। তার পায়ের নিচে মেঝেটা যেন দুলছে! কুর্নিশ করে সে জোড়হাতে দাঁড়ায় আমীরের সামনে!

আমীর দু'হাত তুলে ইশারা করতেই সর্দার ও বাঁদীরা সব বেরিয়ে যায়। রক্তচক্ষু মেলে তিনি তাকান বেগমের দিকে। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আটকে যায় বেগমের কোমরের নিচে। তিনি চমকে ওঠেন। উঠে দাঁড়ান কুর্সি ছেড়ে। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ভালো করে তাকান আবার। তারপর বেগমের মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করেন, —যা দেখছি, এ কি করে হল ?

বেগম নিরুত্তর। মুঠোয় ধরা পাখির মতো থর থর করে কাঁপছে তার সমস্ত শরীর।

—বল, জবাব দাও।

বেগমের দৃষ্টি আরো অবনত হয়।

—এ কেমন করে হল ?

উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন আমীর,—কে এর জন্যে দায়ী ? বল উত্তর দাও।

—আমার স্বামী। কোন বদ্ধমুখ গুহার ভিতর থেকে যেন ক্ষীণ আওয়াজ বের হয়।

—তোমার স্বামী ? সে তো আমি।

—আপনি পাঁচ বছর আগে আমাকে ত্যাগ করেছেন, জাহাঁপনা! আমি আবার শাদী করেছি।

—শাদী! কে, কে তোমার স্বামী ? কি নাম তার ?

—জুল কদর।

—জুল কদর! কে সে ?

—কারিজা মহলের গোলাম।

—গোলাম! সে তো হিজড়ে।

গুলফামের মুখ থেকে আর কোন কথা বেরোয় না। সে ভয়ে কাঁপছে।

আমীরের সমস্ত শরীরে কে যেন বিছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন,—দিলবাহার!

—জাহাঁপনা! ছুটে আসে হিজড়ে সর্দার।

—দু'নম্বর আসামী! হাঁক দেন আমীর।

হাত-বাঁধা আসামীকে আমীরের সামনে হাজির করা হয়।

আমীরের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তিনি আসামীর দিকে তাকান। দাড়ি-গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই তার মুখে।

—এ কি হিজড়ে ?

হিজড়ে প্রহরীরা লম্বা চুল রাখে আর পোশাক পরে মেয়েদের মতো। কিন্তু এ পুরুষের পোশাক পরেছে, চুল ছাঁটিয়েছে পুরুষের মতো।

আমীর বুঝতে পারে—লোকটা হিজড়ে নয়, মাকুন্দে।

আমীর চোখ ফিরিয়ে নেন। মাকুন্দেটার মুখ না দেখাই ভালো ছিল। দেশের একটি প্রবাদ : *"যদি দেখ মাকুন্দের মুখ, ফাঁড়া নজগিদ, নজদিগ দুখ।"*

আমীর কিছুক্ষণ চিন্তা করেন—এ গুরুতর অপরাধের শাস্তি কি ? মৃত্যুদণ্ড ? মৃত্যুদণ্ড তো বটেই, কিন্তু কি উপায়ে, তা ঠিক করে উঠতে পারেন না তিনি। রাগে—ঘৃণায় বিকৃত হয় তাঁর মুখ। তিনি বা হাত তুলে কড়ে আঙুল নেড়ে ইশারা করেন—মাকুন্দেটাকে নিয়ে যাক, সরিয়ে নিয়ে যাক তাঁর সুমুখ থেকে।

রাত বেড়ে চলেছে। আমীর শিশমহলের সুবৃহৎ জলসা ঘরে পায়চারি করেন, আবার কখনো সোফায় গা এলিয়ে দেন। পাশ-টেবিল থেকে তুলে নেন পানপাত্র। চৌথা মহলের বেগম একের পর এক তিন বার ফুলের তোড়া পাঠিয়েছেন। চৌথা মহলেই আজ তাঁর রাত্রি যাপনের পালা। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। রাগ ও ক্ষোভের দাবদাহে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলছে। ক্ষোভ তাঁর নিজের ওপরও কিছু কম হয়নি। তাঁর মনে একই কথা বারবার আনাগোনা করে—আগেকার দিনে রাজা-বাদশারা ক্রীতদাসদের খোজা করে হারেমে জায়গা দিত। আর তিনি একটা বেওকুফের মত রাজ্যের হিজড়েগুলোকে এনে হারেমে জায়গা দিয়েছেন। একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে পুষছেন এ বিকৃতজন্মা মানুষগুলোকে। তার ফল ভালো করেই ফলেছে।

আবার তাঁর মনে হয়—কাজটা যে মহৎ, তা তাঁর কোন মহাশত্রুও অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু হারেমে ঢোকাবার আগে প্রত্যেকটাকে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার ছিল। এর জন্যে দায়ী হারেমের সর্দার দিলবাহার।

এবারে তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে সর্দারের ওপর। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে হিজড়ে সংগ্রহের ভার ছিল তারই ওপর। সে তার কাজে চরম গাফিলতি দেখিয়েছে। মৃত্যুদণ্ডই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি।

হারেমের সমস্ত হিজড়েগুলোকে একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার—সিদ্ধান্ত নেন আমীর। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ? ডাক্তার বা বাইরের কোন লোককেই এ কাজের ভার দেয়া যায় না। বাইরে জানাজানির ভয় আছে, মান-ইজ্জতের প্রশ্ন আছে। না, মৃত্যুদণ্ডের আসামী সর্দার দিলবাহারকে দিয়েই হাসিল করতে হবে এ কাজ। এটাই হবে উত্তম ব্যবস্থা। হারেমের ঘটনার প্রধান সাক্ষী দিলবাহার। তার জান কবচের সাথে চাপা পড়ে যাবে এ কেলেঙ্কারী।

—দিলবাহার। হাঁক দেন আমীর।

শিশমহলের বাইরে অপেক্ষা করছিল দিলবাহার। ডাক শুনে ছুটে আসে, কুর্নিশ করে সুমুখে দাঁড়ায়।

নিচু গলায় হুকুম শুনিয়ে আমীর বলেন,—যাও। আজ রাত্রের মধ্যে কাজ সেরে কালই আমাকে জানাবে।

* * * *

চৌথা মহলে অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গ আমীরের। বেগম খবর দেন—পাঁচ জন হিজড়েসহ সর্দার দিলবাহার পালিয়েছে।

পুরানা লালুক্ষেত, করাচী
৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ মে, ১৯৫৬

গল্পে ব্যবহৃত অ-প্রচলিত শব্দ-পরিচিত

আ–আরবী ফা–ফার্সী স–সংস্কৃত হি–হিন্দী

অছিয়ত—পরবর্তীদের করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ [আ]

উরস, উরুস—পীরের দরগায় বা পীরের নামে উৎসব [আ]

এলাহান, এলহান—সুর [আ]
ওবা—ভূত বিশেষ
ওয়ালেদ—পিতা [আ]
কাছীদাহ্—কবিতা [আ]
ক্যাড়া—বহুপদী কীট বিশেষ [স কীট, হি কিড়া]
খাহেশ—বাসনা [ফা]
খোদাপাবন্দ—খোদাভক্ত [ফা]
গড়ান দেয়া—জাল ফেলা, মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে জাল টানা।

গুর্জ—গদা
চরণচৌকি—পা রাখবার গদি-আঁটা টুল, footstool

তনখাখোর—বেতনভোগী (ইঙ্গিতে ঘুষখোকো)
তাহরিমা বাঁধা—নিয়াত পড়ে দু'কান স্পর্শ করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে ডান হাত নাভীর ওপর চেপে নামাজ পড়তে শুরু করা
তাঁবে—অধীনে [আ তা'বি]
তাহজীব ও তমদ্দুন—সভ্যতা ও সংস্কৃতি [আ]
দড়া-কেদারা—ইস্পাতের দড়ায় ঝোলান বিদ্যুৎ-চালিত চেয়ার, rope-chair, cable-car

দড়াপথ—রজ্জুপথ, ropeway
দোদুল-কেদারা—দোলনা-চেয়ার rocking chair
নযম—পদ্য, কবিতা [আ]
নাছারা—খৃষ্টান [আ]
পয়দায়েশনামা—জন্ম-বিবরণ লিখিত দলিল [ফা]
পেডের ঝুলি—পেটের নাড়ী-ভুড়ি
ফজিলত—মর্যাদা, মহিমা [আ]
ফতোয়া—ইসলামী বিধানসম্মত রায় [আ]
ফরজন্দ—সন্তান, পুত্র [ফা]
বালা-মুসিবত—আপদ-বিপদ [আ]

মরিয়ম ফুল—আরব দেশীয় ফুল বিশেষ; শুকনো এ ফুল ভিজিয়ে রাখলে বা ভিজান পানি প্রসূতিকে খাওয়ালে নির্বিঘ্নে প্রসব হয় বলে অনেকের বিশ্বাস।
মর্তবা—মহিমা, মাহাত্ম্য [আ]
রহম—দয়ামায়া [আ]
শেরেকী—সৃষ্টিকর্তার অংশীদারে বিশ্বাস।
হুজরা—হুজুর যে নির্জন কক্ষে ধ্যান জিকির করেন [আ]
হেকায়াত—গল্প [আ]

❑